পরিবেশ | পরিকাঠামো | পর্যটন | জঙ্গল | জনসত্ত্বা | শিক্ষা | স্বাস্থ্য | সাহিত্য | সংস্কৃতি

এখন ডুয়ার্স

সেপ্টেম্বর ২০১৪ | মূল্য ১২ টাকা

সংক্রমণে নাজেহাল বর্ষার রূপসী ডুয়ার্স

এখন ডুয়ার্স

সম্পাদনা
প্রদোষ রঞ্জন সাহা
নিখিলেশ রায়চৌধুরী
অমিত কুমার দে

কলকাতা দপ্তর
এই অবকাশে, ১৮/৭ ডোভার লেন,
কলকাতা ৭০০ ০২৯

মুদ্রণ
অ্যালবাট্রস

ইমেল ekhonduars@yahoo.com

গয়েরকাটা ৪
ইংরেজদের ডুয়ার্স সফর ৮
ডুয়ার্সে বিপন্ন শৈশব ১১
সীমান্ত শহর জয়গাঁ ১৬
রকি আইল্যান্ড ১৯
সংক্রমণে নাজেহাল ডুয়ার্স ২২
লজ্জায় মুখ ঢাকো জলদাপাড়া ২৬
ময়াল রয়্যালের আলিপুরদুয়ার ২৮
আশ্চর্যময়ী ৩০

প্রচ্ছদ ছবিটি তুলেছেন ডাঃ প্রদীপ্ত চক্রবর্তী

ছবি : পুষণ দেবমল্লিক

EKHON DUARS, Vol-1, Issue-4, DL No.-65, dtd. 24.03.2014

অসাংবিধানিক

কলকাতা থেকে সদ্য পৌঁছনো একগুচ্ছ ঝকঝকে ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা সবে তাঁদের ভাড়া-করা এস ইউ ভি-র শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কুঠরি থেকে শিলিগুড়ির ফুটপাথে পা রেখেছেন। দেখে মনে হয় সিনেমা শুটিং টিম নয়, সাংবাদিকও নয়। হতে পারে সরকারি বড় মাপের কেউ কিংবা ডাক্তার। সহসা কোত্থেকে এক আধপাগলা বুড়ো চলে এল তাদের সামনে। আব্দার জানাল, এক কাপ চা খাওয়াতে হবে। দলের কেউ একটা তার হাতে একটা কয়েন গুঁজে দিতেই বুড়োর হঠাৎ শরীর কাঁপিয়ে খিক খিক হাসি, 'শুয়োরের বাচ্চারা সব সেলিব্রিটি হয়ে গেছে। তবে সেলিব্রিটিরা যাবে কোথায়?'

রাজপথে এহেন মন্তব্যে সবাই অপ্রস্তুত। কেউ কিছু বলার আগেই বুড়ো ধাঁ। টুরিস্ট ছাড়াও উত্তরবঙ্গের পথে সরকারি-বেসরকারি বহিরাগত ভি আই পিদের আনাগোনা এখন চোখ সওয়া হয়ে গেছে। কারণ মুখ্যমন্ত্রী এখন উত্তরবঙ্গে ঘন ঘন আসেন, এখানে এখন একটি ঝাঁ চকচকে দপ্তর তৈরি হয়েছে। আরও অনেক কিছু হওয়ার পরিকল্পনা চলছে। কিন্তু এ সবকে ছাপিয়ে গত দু'-তিন মাস উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স এখন যাবতীয় সংবাদ মাধ্যমের শিরোনামে। সৌজন্যে ডুয়ার্সের কুখ্যাত মশককুল হলেও আসল কালপ্রিট সেই বরাহনন্দনের দল। প্রতিবেশী আসাম রাজ্য থেকে বরাহ-মশক যুগলবন্দীতে এক মারণ ভাইরাস ডুয়ার্সের মাটিকে হঠাৎ করেই বধ্যভূমিতে পরিণত করে তুলেছে। ভাইরাসের দাপটে রীতিমতো দিশেহারা সরকারি চিকিৎসা পরিকাঠামো। তবে এর আগে বার্ড ফ্লু-র মোকাবিলায় মুরগি নিধনের মতো এক্ষেত্রে শূকর নিধন হয়নি, কারণ কিছু নীতিগত ও টেকনিক্যাল সমস্যা রয়েছে। বরং শূকর বাহিনীকে আলাদা করে ফ্যানের হাওয়া ও অন্যান্য স্বাচ্ছন্দে রাখা হয়েছে, এবং তা নিয়ে মিডিয়া অন্তত কোনও ব্যঙ্গ বা টিপ্পনির সুযোগ পায়নি।

মশকবাহিত রোগ ডুয়ার্সে নতুন কিছু নয়। ইতিহাসের পাতা ঘাঁটলে যেমন ম্যালেরিয়া আক্রমণে বহু মানুষের মৃত্যুর কথা জানা যাবে, তেমনই বাবা মায়ের সঙ্গে উইকএন্ডে ডুয়ার্সের বনবাংলোয় বেড়াতে গিয়ে মশার কামড়ে ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে দু'-তিন দিনের মধ্যে কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই বারো বছরের কিশোরের মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার মতো বেদনাদায়ক ঘটনাও মোটেও পুরনো নয়। এই মুহূর্তে যে মশকবাহিত রোগটি ডুয়ার্সের মাটিতে মারণ যজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে সেটিও একেবারে আনকোরা নতুন নয়, বছর দুয়েক আগেই তার উপস্থিতি মালুম হয়েছিল। কিন্তু আক্ষেপ সেই এক জায়গাতেই গিয়ে দাঁড়ায়। দীর্ঘদিনের বঞ্চনা ও অবহেলার পরিণাম। রোগবাহক মশাদের স্বর্গরাজ্য বলে পরিচিত ডুয়ার্সে গত পঞ্চাশ বছরে কোনও পতঙ্গ বিশেষজ্ঞ বা মশা নিয়ে নিয়মিত সমীক্ষা চালানোর আলাদা কোনও বিভাগ তৈরির উদ্যোগ স্বাস্থ্য দফতর কখনও নিয়েছে বলে জানা নেই। ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু বা এনকেফেলাইটিসের মতো রোগ প্রতিরোধে টীকাকরণ বা মশা নিয়ন্ত্রণের চাইতেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ গ্রামেগঞ্জে প্রচার করে জনচেতনা বাড়িয়ে তোলা। দাতব্য চিকিৎসা বা রক্তদান শিবিরের ঘনঘটা থাকলেও স্বাস্থ্য চেতনার জন্য সেই অনুপাতে আদৌ ক'টা ক্যাম্প হয়েছে সেই তথ্য কি পাওয়া যাবে?

এনকেফেলাইটিস একবার ছড়িয়ে পড়লে তা নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি প্রায় নেই বলেই বিশেষজ্ঞদের অভিমত। অতএব কেবল সরকারি স্বাস্থ্য দফতরকে দোষারোপ করে হাত ধুয়ে ফেললে চলবে না। রাজনৈতিক দলগুলি এবং সমাজ ও পরিবেশ সংস্কারের 'দায়বদ্ধতায়' আবদ্ধ তথাকথিত সংস্থাগুলির কি এগিয়ে আসার প্রয়োজন অনুভব করছে না? আর গ্রামীণ মানুষগুলির মধ্যে জনস্বাস্থ্য চেতনা বাড়িয়ে তোলার জন্য কিছু কলাম সেমি জায়গা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নিজেদের গাঁট থেকে খরচ করতে পারে না তাবড় দৈনিক সংবাদপত্রগুলি? সরকারের সমালোচনায়-বিদ্রূপে-বিশ্লেষণে কাগজের বিক্রি বাড়ে নিঃসন্দেহে, কিন্তু সেটাই কি মানুষকে সচেতন করার একমাত্র রাস্তা?

সেই আধপাগলা বুড়োর কথা না হয় ছেড়ে দিলাম, ডুয়ার্সের পথেঘাটে যদি সবাই যদি আজ সেই মহার্ঘ শব্দবন্ধটি আকছার ব্যবহার করতে শুরু করে তো 'অসাংবিধানিক' বলে সামলাতে পারবেন?

আড়ালে ডুয়ার্স

অবহেলায় বিস্মরণে কেমন আছে আজ

গয়েরকাটা

৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে উত্তরদিকে চলতে চলতে হঠাৎই সবুজ ঝেঁপে আসে। প্রথমে গোঁসাইরহাট বন, বন মিশে যায় ছোট্ট চা-বাগানে। উপত্যকার মতো এক অনাবিল সৌন্দর্য। নিসর্গ আন্তরিকভাবে যেন বলে ওঠে— এসো, এটাই ডুয়ার্স, এখান থেকে যত এগোবে ততই, সবুজ, ততই প্রাণ। আর কিছুটা এগোলেই আংরাভাসা নদী। তার আগে অবশ্য ডুডুয়ার সঙ্গেও দেখা হয়ে যাবে। আংরাভাসা নতুন ব্রিজে উঠলেই মন ভালো হয়ে যায়। আঁকাবাঁকা টলটলে নদী। নদীর গা থেকেই গয়েরকাটা চা-বাগান। এই চা-বাগানের কোয়ার্টারেই ছোট্টবেলা কাটিয়েছেন বাংলা কথাসাহিত্যের দিকপাল লেখক সমরেশ মজুমদার। তাঁর লেখায় বার বার ফিরে ফিরে এসেছে এই বাগানের কথা, এই জনপদের কথা।

গয়েরকাটা শান্ত স্নিগ্ধ, অথচ অন্যরকম এক জনপদ। এখানে এলেই এক অন্য ভালো লাগা। চারদিকের শ্যামলিমা, মানুষের শান্ত জীবনযাপন, ব্যস্ততাবিহীন দিনরাত যেন কবিতার মতো। গয়েরকাটা চা-বাগানের কোয়ার্টারে বসে কথা বলছিলাম প্রবীণ লেখক, অনুভবী মানুষ ব্রজগোপাল ঘোষের সঙ্গে। জীবনের অনেকটা সময় যিনি গয়েরকাটা এবং বাগিচা-অঞ্চলে কাটিয়ে দিয়েছেন। কথায় কথায় গয়েরকাটার কত কথা। তাঁর কাছেই জানলাম— গয়েরকাটা নামটা এসে থাকতে পারে 'গারোখোটা' থেকে, গারো উপজাতির আবাসস্থল। কিংবা 'গৈরখোটা' শব্দ থেকে, 'গৈর' মানে হাতি। মনে হয় দ্বিতীয়টাই বেশি প্রযোজ্য। গবেষক বিমলেন্দু মজুমদার অবশ্য বলেছেন, রাভা জনজাতির গ্রাম খয়েরকাটা ভুল সাহেবী উচ্চারণে একসময় গয়েরকাটায় পরিণত হয়েছে। গয়েরকাটার গায়ে লাগানো বনাঞ্চলে হাতিদের অবাধ বিচরণ। তাঁর সংগ্রহ থেকে পেয়ে গেলাম ১৯৭০-এ প্রকাশিত বি.সি.ঘোষ-এর লেখা 'দ্য ডেভেলপমেন্ট অব টি ইন্ডাস্ট্রি ইন দ্য ডিস্ট্রিক্ট অব জলপাইগুড়ি' বইটি। সেখান থেকে জানতে পারলাম, আজ যেখানে গয়েরকাটা চা-বাগান, সে জায়গায় সম্ভবত একদা নীলচাষ হত। ১৮৮৯/৯০ সাল নাগাদ নীলচাষের সেই জমি রূপান্তরিত হয় চা-বাগানে। কাছাড় বাগানের অবসরপ্রাপ্ত ম্যানেজার মি. ডি স্টুয়ার্ড ম্যাকিনটশ সাহেব এই চা-বাগিচার দায়িত্ব নিয়ে আসেন। তিনি হন এই বাগানের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর। তাঁর সংস্থার নাম M/S. Mackillican and Co. তাঁরই উদ্যোগে এখানে ১৮৯৬ সাল নাগাদ ব্ল্যাক টি তৈরি শুরু হয়। তবে এই বাগানের মূল উপার্জন ছিল চা বীজ বিক্রি। এই গয়েরকাটা থেকে চায়ের বীজ যেত দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তো বটেই, তার বাইরে জাভা, সুমাত্রা, নিউ জেনিয়া ইত্যাদি নানান দেশে। Messrs. Gillanders Arbuthnot and Co. এই বাগানের সার্বিক দায়িত্ব নেয় ১৯৩৪-এ। ডুয়ার্সের অন্যতম প্রাচীন চা-বাগান এটি। এখন অবশ্য হাতবদল হয়ে কোঠারী গ্রুপের কাছে। বিখ্যাত 'উত্তরাধিকার' উপন্যাসে সমরেশ মজুমদার এই গয়েরকাটা চা-বাগানের নাম দিয়েছেন 'স্বর্গছেঁড়া বাগান'।

সমরেশ মজুমদার গয়েরকাটা চা বাগানের যে কোয়ার্টারে থাকতেন তার ডানপাশে রূপসী চা-বাগিচা। তাঁর শৈশবের অনুভূতি এখানেই ডানা মেলেছিল। এখনো সেই চা-বাগান তেমনই আছে। সময়ের অনেক পরিবর্তন হলেও নিসর্গ এখনো এখানে তেমনি অনিন্দ্যসুন্দর। এখনো এখানে অরণ্য ছুঁয়ে সেভাবেই সন্ধ্যা নামে। গয়েরকাটা চা-বাগানের

> আজ যেখানে গয়েরকাটা চা-বাগান, সে জায়গায় সম্ভবত একদা নীলচাষ হত। ১৮৮৯/৯০ সাল নাগাদ নীলচাষের সেই জমি রূপান্তরিত হয় চা-বাগানে। কাছাড় বাগানের অবসরপ্রাপ্ত ম্যানেজার মি. ডি স্টুয়ার্ড ম্যাকিনটশ সাহেব এই চা-বাগিচার দায়িত্ব নিয়ে আসেন।

পেছনে এখনো সূর্যাস্তের ছবি তেমনি অসাধারণ। এখনো এমন ছবি প্রায়ই তৈরি হয়— "বড় বড় জঙ্গলে গাছের সঙ্গে আম কুল ছড়িয়ে আছে। এখন আলো প্রায় নেই বললেই চলে, দৌড়ে আসতে আসতে অনি সেই ডাহুকটার গলা শুনতে পেল। রোজকার মতো কেমন নিঃসঙ্গ গলায় ঝাঁকড়া কুল গাছটার তলায় এসে বসে একটানা ডেকে যাচ্ছে। ডাহুকটার গলার কাছটা সাদা থালার মতো। অনেকদিন দেখেছে অনি। ...... এখন প্রায় সন্ধে হওয়া সময়টায় ডাহুকটার গলার শব্দে কেমন বিষণ্ণ লাগছিল চারপাশ।"

গয়েরকাটা চা-বাগান ছুঁয়ে, কখনো চা-বাগানের বুক চিরে বয়ে গেছে আংরাভাসা নদী। গয়েরকাটা চা-বাগান স্বর্গছেঁড়া চা-বাগানে নামান্তরিত হলেও আংরাভাসা নদী তাঁর উপন্যাসে স্বনামেই উপস্থাপিত। অনামী আংরাভাসাকে এক ব্যাপ্ত পরিচিতি দিয়েছেন সমরেশ। এই ছিপছিপে নদী, নদীকে ঘিরে মানুষের ক্রিয়াকলাপ 'উত্তরাধিকার'-এ

প্রাঞ্জলভাবে বর্ণিত—

"ঝুঁকে পড়ে নিজের ছায়া দেখল ও আঙরাভাসার কালো জলে। মাকে লুকিয়ে ওরা প্রায়ই এই নদীতে স্নান করে। ছোট ছোট নুড়ি বিছানো হাঁটুজলের নদী। এর কোথায় কি পাথর আছে বা না আছে অনি জানে। সেই হলদে রঙের বড় বড় পাথরগুলোর নিচে লাল লাল চিংড়িগুলো গুঁড়ি মেরে পড়ে থাকে, হাত বাড়ালেই হল...."

"অদ্ভুত একটা আঁষটে গন্ধ উঠছে নদীর গা থেকে। চওড়ায় পনেরো ফুট, তীব্র স্রোতের এই নদী চলে গেছে চা ফ্যাক্টরীর ভিতর দিয়ে। ফ্যাক্টরীর বিরাট হুইলটা চলছে এর স্রোতে। বলতে গেলে স্বর্গছেঁড়ার হৃদস্পন্দনের মতো এই নদীর ঢেউগুলো। অথচ ওরা পায়ের তলায় নড়বড়ে পাথর রেখে কতবার পার হয়ে যায়। ও পাশের লাইনের মদেশিয়া মেয়েদের দল যখন নদী পেরিয়ে এ পারে আসে তখন ওদের হাঁটু অব্দি নামা কালো কাপড়ের ঘেরটা পদ্মপাতার মতো স্রোতে ভাসে। কাপড়টাকে ওরা বলে আঙরা। নদীর নাম তাই আঙরাভাসা। এতো স্রোত আর জল কম তাই বড় মাছেরা এদিকে আসে না। তবু একটা জলজ আঁষটে গন্ধ বেরোয় নদীর গা থেকে। চোখ বন্ধ করলে জলের শব্দ খঞ্জনীর মতো বেজে যায়।"

"সামান্য জল সরে গেলে অনি দেখল একটা বিরাট দাঁড়াওয়ালা কালো কাঁকড়া, গোল গোল চোখ তুলে জলের তলায় বসে ওকে দেখল সেটা। তারপর নাচের মতো পা ফেলে ফেলে সরে যেতে লাগল সেটা নদীর ভিতরে। এক গাদা চুনো মাছের বাচ্চা খলবলিয়ে চলে গেল। ছোট সাদা পাথরের ফাঁক দিয়ে লম্বা শুঁড়ওয়ালা একটা লাল চিংড়িকে দেখতে পেল অনি। হঠাৎ মাথার ওপর থেকে পাথরের ছাদটা উঠে যেতে বেচারা বুঝতে পারছিল না কী করবে। বাঁ হাতে পাথরটাকে দাঁড় করিয়ে ডান হাতে খপ করে ধরে ফেলল মাছটাকে। পাথরটাকে নামিয়ে দিয়ে আবার উঠে বসল তার ওপর। হাতের মুঠোয় চিংড়িটা ছটফট করছে। পেটের তলায় অজস্র পায়ের মতো শুঁড়গুলো নাচাচ্ছে এখন। নাকের কাছে নিয়ে এল অনি, চমৎকার জলের গন্ধ। কী ভীষণ কষ্ট হচ্ছে বুকের মধ্যে, এই চিংড়িটাকে আর কোনদিন সে দেখতে পাবে না। হাতের মুঠোটাকে জলের মধ্যে রাখল অনি। আঙুলের ফাঁক গলে জল ঢুকছে। চিংড়িটা মোচড় দিচ্ছে খুব। হাত ওপরে তুলতেই জল বেরিয়ে যেতেই চিংড়িটা লাফ দিল হঠাৎ।"

ছোটবেলার চা-বাগানের জীবনে প্রকৃতিকে নিপুণভাবে পর্যবেক্ষণ করার অনুশীলন সমরেশ মজুমদার-এর সাহিত্য-জীবনকে সমৃদ্ধ করেছে অনেকটাই। তাই একজন সফল কথাকারের নির্মাণে গয়েরকাটার ভূমিকাকে কোনভাবেই খাটো করে দেখা যাবে না।

গয়েরকাটার মূল খ্যাতি ছিল তার সাপ্তাহিক হাটকে ঘিরে। গয়েরকাটা হাটের সূচনা ১৯০০ সালে। চা-বাগান সংস্কৃতিতে হাটের ভূমিকা অনেকখানি। আসলে একসময় হাটগুলোই মেলার রূপ নিয়ে ফেলত। রবিবার চা-বাগানে ছুটির দিন। হয়েছে হপ্তার বেতন। ভিড় হত হাটে। গয়েরকাটার প্রতিবেশী বাগান হলদিবাড়ি চা-বাগান, তেলিপাড়া চা-বাগান, বিন্নাগুড়ি চা-বাগান, মোরাঘাট চা-বাগান।

বনবস্তিতে বসেই কোন এক গোধুলিতে কিশোরী জ্যোৎস্না রাভার গান শুনেছিলাম। এখনো কানে লেগে আছে। কতকাল পড়েও মনে পড়ে সে গান যেন স্বর্গলোক থেকে নেমে এসেছিল। রাভা মেয়েরা স্বচ্ছন্দে দেখায় চিংড়িশিকারের নাচ।

একটু দূরের বাগান থেকেও মানুষেরা আসত গয়েরকাটার রোববারের হাটে। লঙ্কাপাড়া, তাসাটি, কারবালা, বানারহাট, নিউ ডুয়ার্স ইত্যাদি। গয়েরকাটা বাগানে পাওয়া যেত প্রচুর মাছ, মাংস আর স্থানীয় ডিম। টাটকা শাকসবজি নিয়ে বসত স্থানীয় কৃষকেরা। একসময় কাছে দূরের অনেক বাগানের ইউরোপীয় কর্তাদের খাবারের কাঁচামাল যেত গয়েরকাটা হাট থেকেই। চা বাগানের গাড়ি আসত। সেও এক এলাহি ব্যাপার। কেনাকাটায় নেতৃত্ব দিতেন ইউরোপীয় সাহেবের খাস বাবুর্চি। গাড়িতে থাকত মিটকেস। মাছ, মোষ বা পাঁঠার মাংস, ডিমে ভরে উঠত সেই মিটকেস। চামুর্চি বা রামঝোরা-র মতো বড় হাটের সঙ্গে টক্কর দিত গয়েরকাটা। ব্রজবাবু বলছিলেন, 'অনেক কিছুই হারিয়ে গেছে। এই হাটে পাওয়া যেত ছোট ছোট লাল আলু। সেদ্ধ করলেই আঠালো। কী সুস্বাদু।'

শীতকালে ঝুড়ি ভরে আসত কমলালেবু। চামুর্চি থেকে। কবি তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত কবিতা 'সামচির ভূটানি মেয়ে'র কথা মনে পড়ে— 'সামচির ভুটানি মেয়ে গয়েরকাটার হাটে / এনেছিল সোনালি আপেল /....রূপবতী লাল টমাটোর সাথে ছিল টলটলে মারুয়ার মদ / আহ্লাদী হাওয়ায় তার খুলে গেছে উসুঝুলু বুকের আঁচল / ঢিলেঢালা গায়ের কামিজ / দেহাতি রৌদ্রের আঁচে ভিজে ওঠে পাথুরে শরীর'। গয়েরকাটা নিয়ে একটি আস্ত কাব্যগ্রন্থ লিখে ফেলেছেন এ সময়ের শক্তিশালী কবি বিকাশ সরকার। যদিও এখন আসামে থাকেন, গয়েরকাটায় কাটানো তাঁর দিনরাতগুলি বাব বার ফিরে ফিরে আসে তাঁর নস্টালজিক নির্মাণে।

গয়েরকাটায় একসময় ছিল কাঠ ব্যবসায়ীদের বিশাল প্রতিপত্তি, এখন যার অনেকটাই কমে গেছে। সরকারি অফিস বলতে ছিল বন বিভাগের অফিস ও পি ডব্লু ডি অফিস। বনকর্মীরা আয়োজন করতেন কালীপুজো, আর পি ডব্লু ডি কর্মীরা করতেন সরস্বতীপুজো। এই সরস্বতী পুজোয় মঞ্চ করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হত। ১৯৩৫ সালে এখানে মহাধুমধাম করে রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা' মঞ্চস্থ হয়। এই দুই পুজো ঘিরে মেতে উঠত গয়েরকাটা। শুখা সিং নামে এক পাঞ্জাবি ভদ্রলোকের ওয়ার্কশপ ছিল এখানে। ১৯৪১/৪২ নাগাদ সেখানে এক সাধু এসে বলেন, 'দুর্গাপুজো করতে হবে'। তখন থেকে দুর্গাপুজোর শুরু।

একটা অদ্ভুত নিস্তরঙ্গতা খেলা করে গয়েরকাটায়। কেমন যেন তন্দ্রালু ভাব। রোববার ছাড়া গয়েরকাটার দুপুর কেমন শুনশান। সন্ধে নামতেই কেমন যেন চুপচাপ।

গয়েরকাটাকে ছুঁয়ে কী নির্মল প্রাকৃতিক সম্পদ। হাইস্কুলের সামনে দিয়ে যে রাস্তা পশ্চিমমুখো, কিছুটা এগোলেই চাবাগান, আর তারপর অসাধারণ রূপলাবণ্যে ভরপুর মধুবনী নদী। আকারে ছিপছিপে। কিন্তু সবুজ ক্যানভাসে অপরূপা। নদীর গা ছুঁয়েই শুরু মোরাঘাট রেঞ্জের বন। ধূপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির অর্থানুকূল্যে মধুবনী নদীর তীরে এখন পার্ক তৈরি হয়েছে। থাকবার বন্দোবস্তও হয়েছে। বিবাদী স্বনির্ভর গোষ্ঠীর তত্ত্বাবধানে পার্কটি চলছে। দশ টাকা টিকিটে প্রকৃতির কোলে অনাবিল অনেকটা সময় কাটিয়ে দেওয়া যায়। আপাতত তিনটি নন-এসি এবং একটি এসি দ্বিশয্যার কটেজ রয়েছে। (থাকবার জন্য যোগাযোগ করা যেতে পারে— কানাই চ্যাটার্জি, ৯০০২৯২২৩০৬)। এখানে সেতু পেরোলেই বন। ঝকঝকে রাস্তা বনের বুক চিরে চলে গেছে দুরামারি-নাথুয়ায়। রাস্তার মাঝে মাঝে বন্য ঝোরা। একসময় মেছুয়া পুলে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত। অনেকে মাছ দেখতে আসতেন সঙ্গে মুড়ি-বিস্কুট নিয়ে। গয়েরকাটা থেকে খুব অল্প সময়েই পৌঁছে যাওয়া যায় খুট্টিমারি বনবাংলোয়, গোঁসাইরহাট পক্ষী আলয়ে। মন চাইলে রাভাবস্তিতে গিয়ে কাটিয়ে আসা যায় বনের কোলে থাকা আদিবাসীদের সঙ্গে। গনাথ রাভা তাদের নেতৃস্থানীয় মানুষ। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে রাভা সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হলে ভালো লাগায় মন ভরে উঠবেই। মনে পড়ে, বনবস্তিতে বসেই কোনও এক গোধূলিতে কিশোরী জ্যোৎস্না রাভার গান শুনেছিলাম। এখনো কানে লেগে আছে। কতকাল পরেও মনে পড়ে সে গান যেন স্বর্গলোক থেকে নেমে এসেছিল। রাভা মেয়েরা স্বচ্ছন্দে দেখায় চিংড়িশিকারের নাচ।

প্রকৃতি ও পর্যটন নিয়ে দীর্ঘদিন অসাধারণ কাজ করে আসছে গয়েরকাটার 'আরণ্যক'। এই সংস্থার অন্যতম কর্ণধার কানাই চ্যাটার্জি (যিনি নিজে কৃতী বাচিক শিল্পী ও সংস্কৃতিকর্মী) জানালেন, তাঁদের অনেক স্বপ্ন গয়েরকাটাকে কেন্দ্র করে পর্যটনের সম্ভাবনা নিয়ে। এ বছরেরই মার্চ মাসে মালবাজারে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করে গেছেন গয়েরকাটার পর্যটনবিকাশে প্রায় দেড় কোটি টাকা রাজ্য

সরকার দেবে, যা দিয়ে মধুবনীতে গড়ে উঠবে ওয়াচ টাওয়ার, কটেজ, মিটিং হল, ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টার ইত্যাদি। বনদপ্তর ভাবছে, এখান থেকে জঙ্গলে কার সাফারি ও হাতি সাফারি চালু করার কথা। 'আরণ্যক'ও দীর্ঘদিন থেকে এসব দাবিতে সোচ্চার হয়েছে। সত্যিই তো এসব হওয়া দরকার। মনে পড়ে বৃষ্টি হয়ে যাওয়া এক বিকেলে এই বনের মধ্য দিয়ে তোতাপাড়ার পথে পেখম তোলা অসংখ্য ময়ূরের নাচের সেই অনির্বচনীয় দৃশ্য, এই বনের ভেতরেই এক সকালে দেখেছিলাম পরস্পর লেজ ধরা একগুচ্ছ বাঁদরের অবাক-করা মিছিল, মধুবনী নদীর তীরে জল খেতে আসা হাতির দল।

সংস্কৃতিচর্চায় গয়েরকাটার একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এখানকার রিডিং ক্লাব ডুয়ার্সের অন্যতম পুরনো ক্লাব, যার জন্ম ১৯১২ সালে। এদের নিজস্ব ঘূর্ণায়মান মঞ্চ ছিল। রিডিং ক্লাবের নাট্যোৎসব সারা ডুয়ার্সে খ্যাত। গয়েরকাটার রণেন মুখোপাধ্যায় (বেনু নামেই পরিচিত) একসময় শিক্ষাসংস্কৃতির আঙিনায় আলোড়ন তুলেছিলেন। তাঁর অকালে চলে যাওয়া গয়েরকাটাকে আজো শোকস্তব্ধ করে। অকালেই চলে গেছেন চা-বাগানের জয় ঘোষ। কী মিষ্টি কবিতা লিখত। চা-বাগান থেকে দুর্গাপুজোয় বেরত একটি অদ্ভুত সুন্দর পত্রিকা 'মাতল রে ভুবন', এখান থেকেই ব্রজগোপাল ঘোষ বের করেছিলেন সাহিত্যপত্র 'মন্দার'। সম্ভবত সতী সেনগুপ্ত তাঁর বিখ্যাত 'পাবক' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা গয়েরকাটা থেকেই প্রকাশ করেছিলেন। গয়েরকাটার নন্দদুলাল সরকারকে নিয়ে কিংবদন্তী কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন, 'গয়েরকাটার নন্দ / গায়ে কাঠের গন্ধ'। ডুয়ার্সের এই কবির কাছে এসে থেকেছেন দিকপাল অনেক কবি লেখক। অথচ কবিতার জগৎ থেকে স্বেচ্ছা নির্বাসন নিয়ে তিনি সোনাখালির কোলে এক সবুজ ছোট্ট চা-বাগানে কাটিয়ে দিলেন তাঁর জীবন। 'গয়েরকাটার নন্দ' এখন ৮৮-তে। গয়েরকাটা হাইস্কুলের এক সময়ের প্রধান শিক্ষক মণীন্দ্রলাল বসু ১৯৮৪ সালে অবসর নিয়েছেন, কিন্তু কিংবদন্তী হয়ে রয়ে গেছেন এই জনপদে তাঁর অসাধারণ কাজের জন্য।

বাবলা রক্ষিতের নাচের দল তাদের আধুনিকতায়, ভাবনার উৎকর্ষতায় সারা

ডুয়ার্স মাতিয়ে বেড়াচ্ছে। গয়েরকাটাতে শিক্ষকতা করতে এসে এখানের সাংস্কৃতিক জগতের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে পড়েছেন উত্তরের বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী নীপা ঘোষ ভট্টাচার্য।

খেলাধূলাতেও গয়েরকাটার চর্চা কম নয়। শুধু স্থানীয় মাঠে নয়, অনেক বড় ক্ষেত্রে দাপিয়ে খেলেছেন সাধন মুখার্জি, প্রসাদ মুখার্জি-র মতো কৃতী খেলোয়াড়েরা।

তবে গয়েরকাটার আকাশে-বাতাসে ঘুরে বেড়ায় এক নিভৃত অভিমান। অনেকটাই অবহেলিত সে।

এখানে গড়ে তোলা হয়নি স্বাস্থ্যকেন্দ্র। স্কুল থাকলেও কোনও কলেজ নেই, কত কষ্ট করে ছেলেমেয়েদের বাইরে পড়তে যেতে হয়। নেই কারিগরী শিক্ষার কোনও বন্দোবস্ত। ইলেক্ট্রিক সাবস্টেশন তৈরি হওয়া দরকার। প্রচুর সরকারি জমি খালি পড়ে আছে। পরিকল্পনামাফিক কত কিছুই করা যায়। অনেকেই বলেন, প্রশাসন উদাসীন।

তবু গয়েরকাটা গয়েরকাটাই। ডুয়ার্সের এক স্বতন্ত্র জনপদ। কোন ব্যস্ততা নেই। অথচ এক আভিজাত্য আছে। কত জনজাতি নিয়ে, প্রাকৃতিক নান্দনিকতা নিয়ে সে তারই মতো। ডুয়ার্সে এলে গয়েরকাটা ছুঁয়ে না গেলে ডুয়ার্স দেখা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

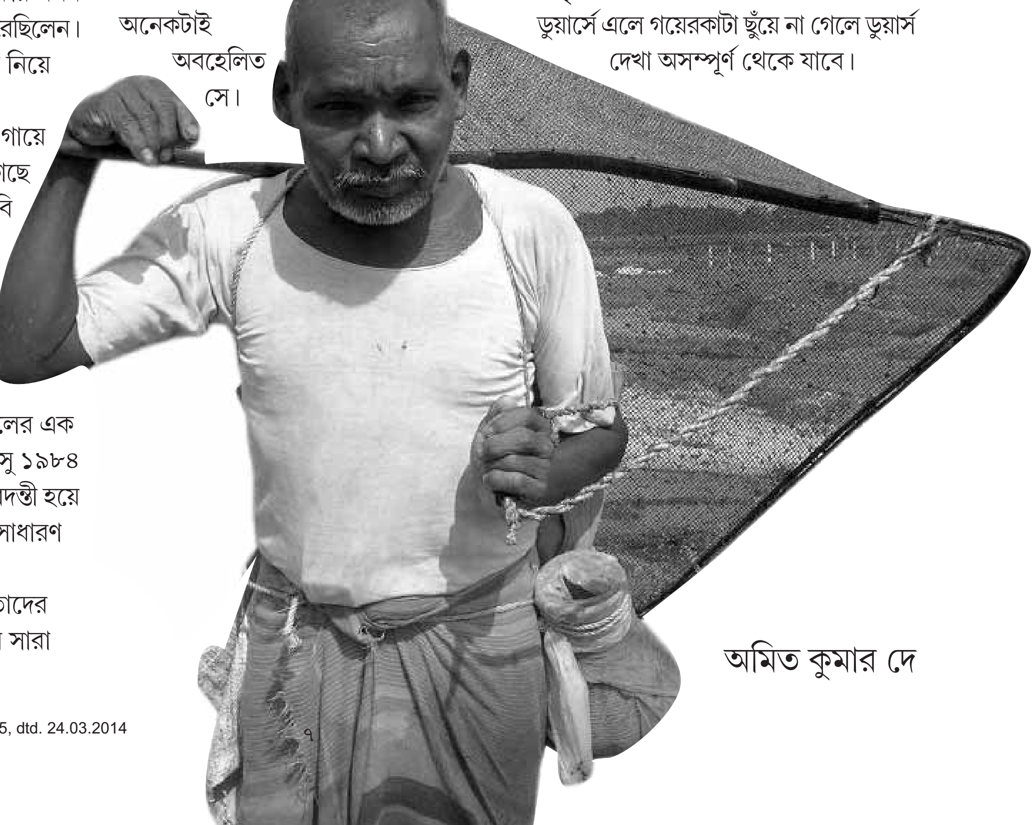

অমিত কুমার দে

হেরিটেজ ডুয়ার্স

ইংরেজদের প্রথম ডুয়ার্স সফর

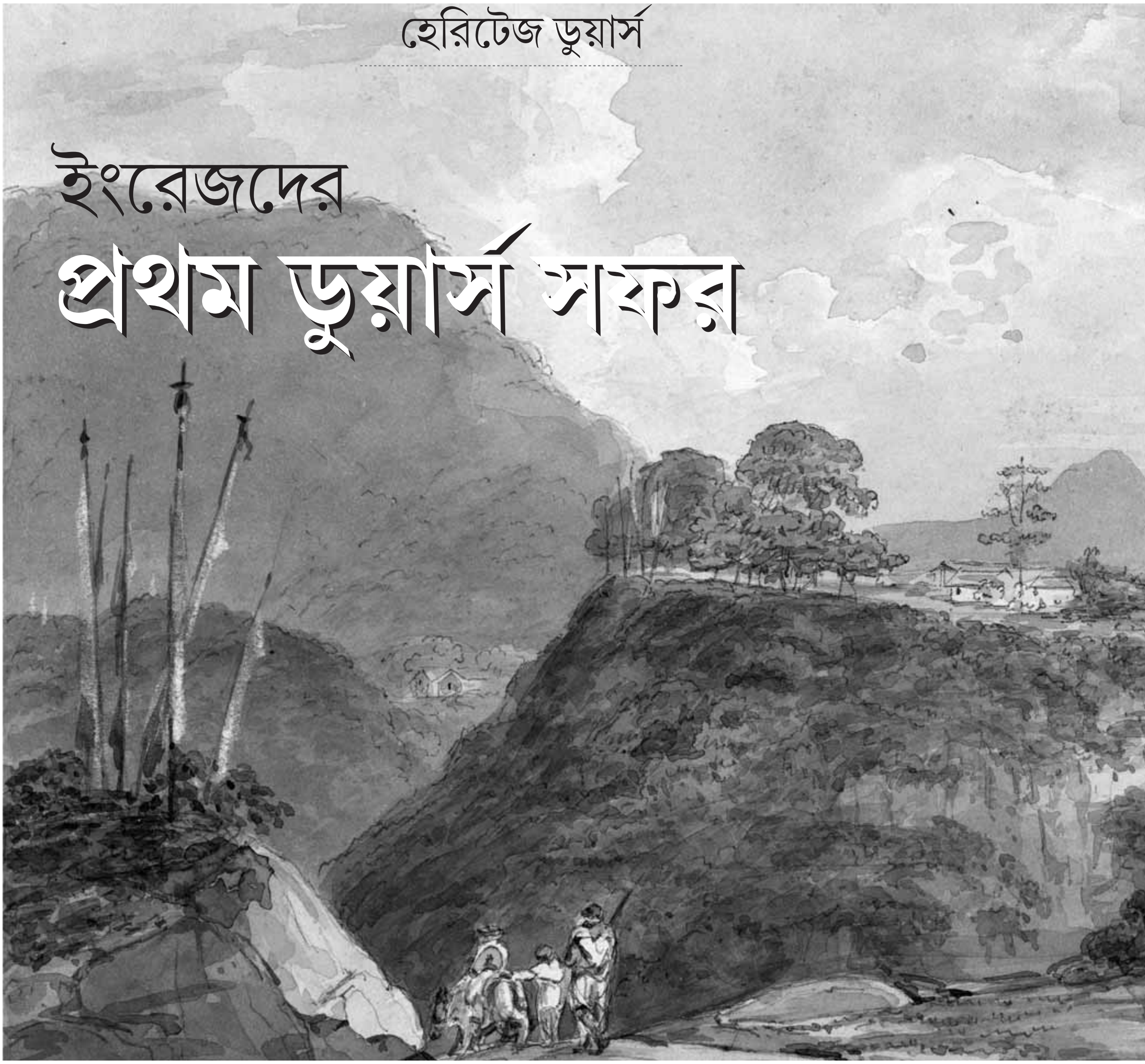

লেঃ স্যামুয়েল ডেভিসের আঁকা বক্সাদুয়ারের ঐতিহাসিক চিত্র (১৭৮৩-৮৪)

গন্তব্য ছিল ভুটান হয়ে তিব্বত। সেই পথেই ডুয়ার্সকে নতুন করে আবিষ্কার করে ইংরেজরা। পলাশীর যুদ্ধ শেষের বছর তিরিশের মধ্যেই।

প্রথম ভুটান যুদ্ধের পর ভুটানের মধ্য দিয়ে তিব্বতের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ওয়ারেন হেস্টিংস কলকাতা থেকে জর্জ বোগলের নেতৃত্বে একদল প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন, ৬ মে, ১৭৭৪-এ। তৃতীয় পাঞ্চেন লামার সঙ্গে বেশ সৌহার্দ্যপূর্ণ আলাপ-আলোচনা করে বোগলে মিশন ১৭৭৫ সালে ফিরে এলেও অল্পদিনের মধ্যেই পাঞ্চেন লামা (১৭৮০) এবং বোগলের (১৭৮১) মৃত্যুতে ওয়ারেন হেস্টিংসের এই প্রাথমিক প্রয়াস ব্যর্থ হয়।

এরপর আবার নতুন করে সেই প্রচেষ্টা শুরু হয় ১৭৮৩ সালে। ১৭৮৩ সালের ৯ জানুয়ারি ক্যাপটেন স্যামুয়েল টার্নারের নেতৃত্বে আবার এক ইংরেজ প্রতিনিধিদল কলকাতা থেকে তিব্বতের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ে। টার্নার ছাড়াও এই দলে সার্ভেয়ার হিসেবে ছিলেন লেঃ স্যামুয়েল ডেভিস এবং ডাক্তার হিসেবে ডাঃ রবার্ট সন্ডার্স। এঁরা মুর্শিদাবাদ, রঙপুর হয়ে সদলবলে কোচবিহার আসেন ১৭৮৩ সালের মে মাসে। কোচবিহারের মহারাজা ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ তখন দেবদর্শন উপলক্ষে বাণেশ্বরে ছিলেন। তবু দেওয়ান প্রভৃতি রাজকর্মচারীরা যথোপযুক্ত

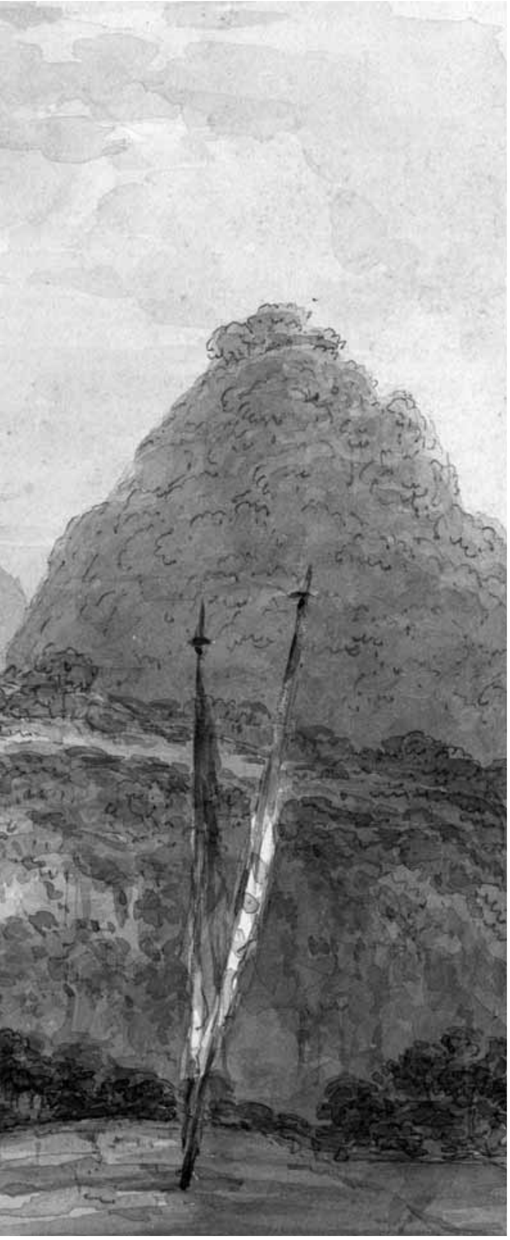

অতিথি সৎকার করেন এবং রাজার প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত তাঁদের কোচবিহারে থাকতে অনুরোধ জানান। কিন্তু দিন কয়েক থেকেই বাসস্থান অস্বাস্থ্যকর বিবেচনা করে আবশ্যক রাজকীয় সাহায্য নিয়ে টার্নার দলবল সহ ডুয়ার্সে ভুটানের সীমান্ত চৌকি চেচাখাতায় পৌঁছান। তারিখটা ছিল ১১ মে, ১৭৮৩। বলাই বাহুল্য এই চেচাখাতা ছিল ভুটান যুদ্ধ খ্যাত চেচাখাতা দুর্গ এবং তৎসন্নিহিত অঞ্চল, অর্থাৎ ১৫৮৬ সনে র‍্যালফ ফিচ যে চেচাখাতা বন্দরের কথা লিখেছিলেন তার থেকে কয়েক কিমি পশ্চিমে। সেই চেচাখাতা বন্যাবিধ্বস্ত হওয়ার পরে নতুন গড়ে ওঠা জনবসতিই হল এই ২ নং চেচাখাতা।

কোচবিহার অবস্থানকালে টার্নার রাজ্যের অবস্থা দেখে কিছু মন্তব্য করেছিলেন যা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন মহারাজা ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ সম্পর্কে তিনি বলেছেন— এক অসমর্থ বৃদ্ধ মানুষ। কোচবিহারবাসীদের আর্থিক দুরবস্থারও বর্ণনা দিয়েছেন। দৈনিক এক পেনি খরচেই তাঁদের দুইবেলার খাবার, যথা ভাত, শাক-সবজি, তেল, লঙ্কার যোগাড় হয়েছে। তবে একজন ইংরেজের চোখে যেটা শোচনীয় আর্থিক অবস্থা বলে মনে হয়েছে তা তখনকার একজন বাঙালি গৃহস্থের কাছে নাও মনে হতে পারে। এমনিতেই কোচবিহারের সাধারণ মানুষের চাহিদা কম। তখন তো আরও কম হওয়াই স্বাভাবিক।

কোচবিহার থেকে ভুটান যাওয়ার পথে রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলের তুলনায় উত্তরাংশ প্রায় জনশূন্য দেখেছিলেন টার্নার। এই উত্তরাংশই আসলে ডুয়ার্স। প্রায় সমস্ত অঞ্চল জুড়ে অকর্ষিত জমি এবং জঙ্গলের প্রাধান্য। বলা বাহুল্য, এই জঙ্গলাকীর্ণ প্রায় জনশূন্য অঞ্চলই বর্তমান ডুয়ার্সের অন্তর্গত, যা সেই আমলে হিংস্র বন্যজন্তু এবং ততোধিক হিংস্র ভুটিয়া লুটেরাদের জন্যই জনমানবহীন, অকর্ষিত এবং অনেক বেশি জঙ্গলময় হয়েছিল। পথে বুনো হাতির দলের দেখা পেয়েছিলেন টার্নার। বিশাল লম্বা উঁচু ঘাসের জঙ্গলও দেখেছিলেন তিনি, যা আসলে ছিল বাঘ-ভালুক-বুনো মোষের আস্তানা।

চেচাখাতা দুর্গ সম্পর্কে টার্নার লিখছেন, দুই সারি বাঁশের তৈরি লম্বাটে প্রাচীরঘেরা অনেকটা এলাকা, এটাকেই এরা দুর্গ বলে। ১৭৭২ সালে আমাদের বাহিনীর সঙ্গে ভুটানবাসীদের যে লড়াই এই ফ্রন্টিয়ারে হয়েছিল তার থেকেই চেচাখাতা দুর্গের নামডাক। তখনকার মতোই এখনও দুর্গের ভিতরে প্রশস্ত জায়গা। চারিদিকে ধারগুলো পাড়ের মতো উঁচু করা হয়েছে। বাঁশগুলো গায়ে গায়ে লাগানো। এখানে ভুটিয়ারা খুবই শৌর্য দেখিয়েছিল। কিন্তু উন্নত আগ্নেয়াস্ত্র ও কামানের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারেনি। কারণ তাদের হাতে ম্যাচলক বন্দুক, তীর-ধনুক আর ভোজালি ছাড়া কিছু ছিল না। যদিও সেই সময় তারা বিতাড়িত হয়, পরে অনেকদিন ধরেই তারা আমাদের উদ্বেগে রেখেছিল। প্রায়ই চেচাখাতা আমাদের হাতছাড়া হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ওদের একেবারে তাড়ানো সম্ভব হয়েছে। বক্সাদুয়ারের ওধারে তাদের বিতাড়িত করা গিয়েছে। যুদ্ধের পরে জায়গাটা আবার নতুন করে গড়ে তোলা হয়েছে। এটাই এখন ভুটান ফ্রন্টিয়ার।

চেচাখাতা থেকে পরদিন অর্থাৎ ১৭৮৩ সনের ১২ মে বক্সাদুয়ারের পথে তাঁর দলবল নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন টার্নার। ৮ মাইল যাওয়ার পর তাঁরা এক গভীর বনে প্রবেশ করলেন। তাঁর কথায়, বিশাল উঁচু উঁচু গাছের ঠাস জঙ্গল। এই জঙ্গলে পালে পালে হাতি গন্ডার এবং ভাল্লুক আছে বলে আমাদের জানানো হয়েছে। অবশেষে সান্তারাবাড়িতে পৌঁছলেন তাঁরা। এখন যদিও সান্তারাবাড়িতে সান্তারা বা কমলালেবুর বাগান নেই, তখন ছিল। টার্নার লিখছেন, কমলালেবুর জন্য এই সান্তারাবাড়ির খুব সুনাম। এখানকার গাছের লেবু খুব কদর পায়।

সান্তারাবাড়ি থেকে এক রীতিমত দুর্গম পাহাড়ি পথে বক্সা দুয়ারের দিকে চড়াই ভেঙে উঠতে লাগলেন টার্নাররা। পথ দুর্গম কিন্তু তার সৌন্দর্যও অসাধারণ। টার্নার লিখছেন, পাহাড়ের শিখর সবই ঘন জঙ্গলে আচ্ছন্ন। সব থেকে উঁচু পাহাড়গুলোর মাথা মেঘে ঢেকে আছে। দেখলেই মুগ্ধ হতে হয়।

বক্সা দুয়ারের আধ মাইলের মতো আগে টার্নারদের সামনে এক ঘোষক এসে হাজির হল। সে দলের সামনে থেকে ঢাক বাজাতে বাজাতে পথ প্রদর্শকের মতো তাঁদের নিয়ে চলল। বক্সা দুয়ারের খুব কাছে পাঁচটি পাহাড়ি মেয়ে বেণী দুলিয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা করল। বক্সা দুয়ারে পৌঁছে টার্নার সেখানকার মোড়লকে পেলেন। তার সম্পর্কে তিনি লিখছেন, এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিটির আমি যখন খোঁজ করছি, হঠাৎ দেখি সে আমার কনুয়ের কাছে দাঁড়িয়ে। খর্বাকৃতি। ভুটিয়া আর বাঙালির সংমিশ্রণ...।

বক্সা ডুয়ার্সের এই অঞ্চল সম্পর্কে টার্নার লিখেছেন, ভুটান পাহাড়ের পাদদেশে প্রায় ৩০ মাইলের মতো অঞ্চল সবুজে সবুজে আচ্ছন্ন। এই অঞ্চলে অজস্র ঝোরা আছে। পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে সেগুলি জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছে। এগুলির জন্যই এত গাঢ় সবুজ হয়েছে বনভূমি। কিন্তু এখানকার আবহাওয়া সফরকারিদের পক্ষে মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়। অসুস্থতা নিত্যসঙ্গী। ১৭৭২ সালে ক্যাপটেন জোনসের নেতৃত্বে যে বাহিনী এখান দিয়ে গিয়েছিল তাদের একটি বড় অংশই অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। কর্নেল স্যার জন কামিং সেই সৌভাগ্যবানদের একজন

যিনি বেঁচে ফিরেছেন। এখনও সেই অভিজ্ঞতার কথা তিনি ভোলেননি।

ভুটান থেকে টাঙ্গন ঘোড়া বেচার জন্য নিয়ে আসা হত কোচবিহার, রঙপুর অঞ্চলে। সেই ঘোড়ার লেজ কাটা থাকত ভুটিয়াদের নানা কুসংস্কারের ফলে। কিন্তু বাজারে সেই ঘোড়ার দাম না থাকায় ক্রমে সেই লেজ কাটার চল বন্ধ হয়। এই ঘোড়ার বর্ণনাও টার্নারের লেখায় আছে।

এই অঞ্চলে আনারসের প্রচলন সম্বন্ধেও টার্নার এক তথ্য জানিয়েছেন — পর্তুগিজেরা সম্রাট আকবরকে আনারস উপহার দিয়েছিল। মোগল বাদশাহেরা আনারসের বাগান করেছিলেন যেগুলি থেকে আওরঙ্গজেবের আমলে বাদশাহ তাঁর বাংলার সেনাপতি মুয়াজ্জেম খাঁকে কাশ্মীর-আফগানিস্তানের আখরোট-বাদাম প্রভৃতির সঙ্গে আনারসও পাঠিয়েছিলেন। টার্নারের মনে হয়েছিল, কোচবিহারেও আনারসের এত ফলনের পিছনে তাদের একটা বড় অবদান ছিল।

চেচাখাতার মতো বক্সা দুর্গ এবং বক্সা দুয়ার সম্পর্কে টার্নার কিছু মন্তব্য করেছিলেন— "বকসা দুয়ারকে পাসাখাও বলে। প্রকৃতিই স্থানটিকে সুরক্ষিত করে রেখেছে। পর্বতমালার এই প্রান্তিক স্থানের সুরক্ষার ব্যবস্থা অধিকতর শক্তিশালী করে তোলা হয়েছে কৌশলে। একটি পর্বতের চূড়া গুঁড়িয়ে দিয়ে বেশ অনেকটা সমতল করে নেওয়া হয়েছে। যে কোনও আক্রমণের হাত থেকে এই দুর্গম গিরিপথ রক্ষার জন্য উপযুক্ত সংখ্যক লোক এখানে রাখা চলে। গিরিখাত থেকে একটু দূরে কয়েক সারি চালাঘর রয়েছে। সেখানে একদল সৈন্য থাকতে পারে। বকসা পাহাড় ও এর বিপরীত দিকে পাহাড়ের মাঝখানে গভীর গিরিখাত। এর মধ্য দিয়ে একটি পাহাড়ি নদী বয়ে চলেছে। সেই খাড়া পাহাড়ের পাশ দিয়ে একটি সরু পথ উপরের দিকে উঠে গিয়েছে। সে পথ দিয়ে পাশাপাশি দু'জনেও চলা যায় না। অতীতে যাঁরা গিরিপথ রক্ষার ঘাঁটি হিসেবে এই স্থান নির্বাচন করেছিলেন তাঁদের বিচারবুদ্ধির প্রশংসা না করে পারা যায় না।

"পাশের আর একটি পাহাড় সমান করে গ্রামের পত্তন করা হয়েছে। সেখানে মাত্র দশ-বারোটি ঘর। এর তিন দিকেই উঁচু পাহাড়। শুধু দক্ষিণ দিক খোলা, বাংলার সঙ্গে যোগাযোগের উন্মুক্ত দ্বার। জমি পাথুরে। মাটির স্তর নেই বললেই চলে। শুধু অবস্থানের গুণে সবুজে ঢাকা।

"সমভূমির লোকের মুখে এর নাম বকসা দুয়ার। এক খামখেয়ালি রীতি থেকে এই নামের উৎপত্তি। পূর্বে ভুটানের টাঙ্গন ঘোড়ার ব্যবসায়ীরা এই পথ দিয়ে বাংলার দিকে নেমে যেত। ঘোড়ার দল নিয়ে এখান থেকে নীচে নামবার সময় প্রতিটি ঘোড়ার লেজ একেবারে গোড়া থেকে কেটে দিত। ফলে ঘোড়ার সৌন্দর্যহানি ঘটত। তার জন্য ভালো দামও পাওয়া যেত না। সে সময় রঙপুরে প্রতিবছর নিয়মিতভাবে ভুটান পণ্যের মেলা বসত। ইংরেজরা রঙপুরে স্থায়ী দপ্তর স্থাপন করার পর ভুটিয়া ব্যবসায়ীদের এই নৃশংস প্রথা লক্ষ করে তাঁরা বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হন। ভুটানিদের তাঁরা এই প্রথা বর্জনের অনুরোধ জানান। বলেন, ঘোড়ার লেজ কাটা বন্ধ করলে ভালো বখশিস দেওয়া হবে। কিন্তু এতে তাদের প্রবল অনিচ্ছা। কারণ স্মরণাতীত কাল থেকে এই নিয়ম চলে আসছে। অগ্রগতির একটি পর্যায়ে এশিয়াবাসীদের সেই চিরন্তন যুক্তি, 'এই আমাদের দস্তুর'। তবে অর্থের লোভ সংস্কারের চাইতেও বড়। পরের বছর বেশ কয়েকটি ঘোড়া অক্ষত লেজ নিয়ে মেলায় এসে হাজির। ঘোড়াগুলি বেশ চড়া দামে চটপট বিক্রি হয়ে গেল। এই ব্যবসায়ীদের পরের বছরেও ঘোড়ার লেজ না কাটার অনুরোধ করা হল। পরের মেলাতেও দেখা গেল তাদের সপুচ্ছ ঘোড়ার দারুণ চাহিদা। অন্য ব্যবসায়ীরা তখন বুঝতে পারল ঘোড়ার লেজ না কাটলেই লাভ অনেক বেশি। এরপর থেকে এই নৃশংস প্রথা বন্ধ হয়ে যায়। রঙপুরের ভুটানি মেলায় তখন থেকে সতেজ সপুচ্ছ টাঙ্গন ঘোড়ার মেলা। সেই অবধি এই দুয়ারের নাম বকশিস দুয়ার বা বকসা দুয়ার, ভুটানিরা অবশ্য একে পাসাখা বলে।"

টার্নারের আগে জর্জ বোগলেও বক্সাদুয়ারের পথেই ভুটান হয়ে তিব্বত গিয়েছিলেন, ১৭৭৪ সালে। বক্সাদুয়ার এবং বক্সাদুর্গ সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্যও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

"খুব ভোরে রওনা হলাম। বাংলার উত্তর সীমান্ত জুড়ে যে পর্বতশ্রেণি দাঁড়িয়ে তা ১৮ মাইল দূরে হলেও মনে হয় ঠিক যেন আমাদের মাথার উপরে। পাহাড়ের কাছাকাছি আসার সঙ্গে সঙ্গে আবহাওয়া ও দৃশ্যাবলীর পরিবর্তন ঘটে গেল। অরণ্যে শাল ও পাইনের ভিড় (বর্তমানে এই অঞ্চলে পাইন গাছ একটিও নেই), তাছাড়া আরও অনেক গাছ। তবে বাংলার গাছের চাইতে অনেক বেশি সতেজ। ছোট ছোট নদীর জল কী পরিষ্কার! বালি, নুড়ি ও পাথরের উপর দিয়ে তর তর করে বয়ে চলেছে। পথ অসমতল। বেলা দুটোর সময়ে আমরা পাহাড়ের পাদদেশে এসে পৌঁছলাম। প্রথম দিকে পাহাড়ে ওঠায় কোনও কষ্ট নেই। বনের মধ্য দিয়ে পথ। গাছে গাছে চমৎকার কুঞ্জ রচনা করেছে। এর পর চড়াই। পথ সরু ও আঁকাবাঁকা। সেনাদলের জন্য এই কি রাস্তা! আরও চার মাইল উঠতে হবে। দু'পাশে ছোট ছোট অনেক ঝরনা। পাহাড়ের পাদদেশ থেকে চূড়া অবধি অরণ্যে আবৃত। বিরাট আকারের বিভিন্ন রকমের গাছ। কোথাও প্রকৃতি যেন নিজ হাতে ক্রীড়াঙ্গন রচনা করে রেখেছে। জলপ্রপাতের শব্দ কানে বাজছে। অবশেষে সন্ধ্যার দিকে আমরা বক্সাদুয়ারে এসে পৌঁছই। এটি একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত। এর পরে আরও উঁচু উঁচু পাহাড়। সেগুলির নীচে গভীর উপত্যকা। বক্সাদুয়ারের চারদিকে আলগা পাথর বসান তিন ফুট উঁচু প্রাচীর। মাঝে একটি চমৎকার বৃদ্ধ বট। ব্যস, এই সব।"

বোগলে বক্সাদুয়ারে পৌঁছেছিলেন ৭ জুন, ১৭৭৪-এ। তাঁর সময়ে বক্সা দুয়ার নামে দুর্গ হলেও বাস্তবে ছিল পর্বতের শীর্ষদেশে পাথরের প্রাচীরঘেরা একটি স্থানবিশেষ।

টার্নার তাঁর দলবল নিয়ে ১ জুন, ১৭৮৩ ভুটানের তাসিজং (তাসি দুর্গ) পৌঁছান। কিন্তু তিব্বতে যাবার অনুমতি পেতে তাঁদের তিন মাসের ওপর সময় লাগে। তাও তাঁরা মাত্র দুইজন যেতে অনুমতি পান। অগত্যা লেঃ ডেভিসকে ফিরে আসতে হয়। ফেরার পথে লেঃ ডেভিস আরও অনেক চিত্রের সঙ্গে বক্সাদুয়ারের একটি চমৎকার রেখাচিত্র অঙ্কন করেছিলেন। ইংরেজদের আঁকা বক্সাদুয়ারের সম্ভবত এটিই প্রাচীনতম চিত্র। সেই চিত্রটি থেকেই সেই আমলের বক্সাদুয়ার এবং বক্সাদুর্গ সম্বন্ধে বেশ কিছুটা ধারণা করা যায়।

টার্নারের তিব্বত যাত্রার উদ্দেশ্য কিন্তু সফল হয়নি। তিনি তিব্বতের রাজধানী লাসায় যাওয়ার অনুমতি না পেয়ে শেষ পর্যন্ত ১৭৮৪ সালের মার্চ মাসে বাংলায় ফিরে আসেন। তবে একথা বলতেই হবে যে, তিনি তাঁর 'এমব্যাসি টু টিবেট'-এ এই অভিযানের যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে সেই আমলের ডুয়ার্স, বিশেষ করে বক্সাদুয়ার সম্বন্ধে বেশ ভালো ধারণা পাওয়া যায়। তার আগে বোগলের সংক্ষিপ্ত অথচ গুরুত্বপূর্ণ বৃত্তান্ত সম্পর্কেও একই কথা খাটে। তবে ডুয়ার্সের ইতিহাসে টার্নারের বিবরণ অনেক বেশি মূল্যবান।

নিজস্ব প্রতিনিধি

হাঁপানির প্রকোপে ডুয়ার্সে বিপন্ন শৈশব

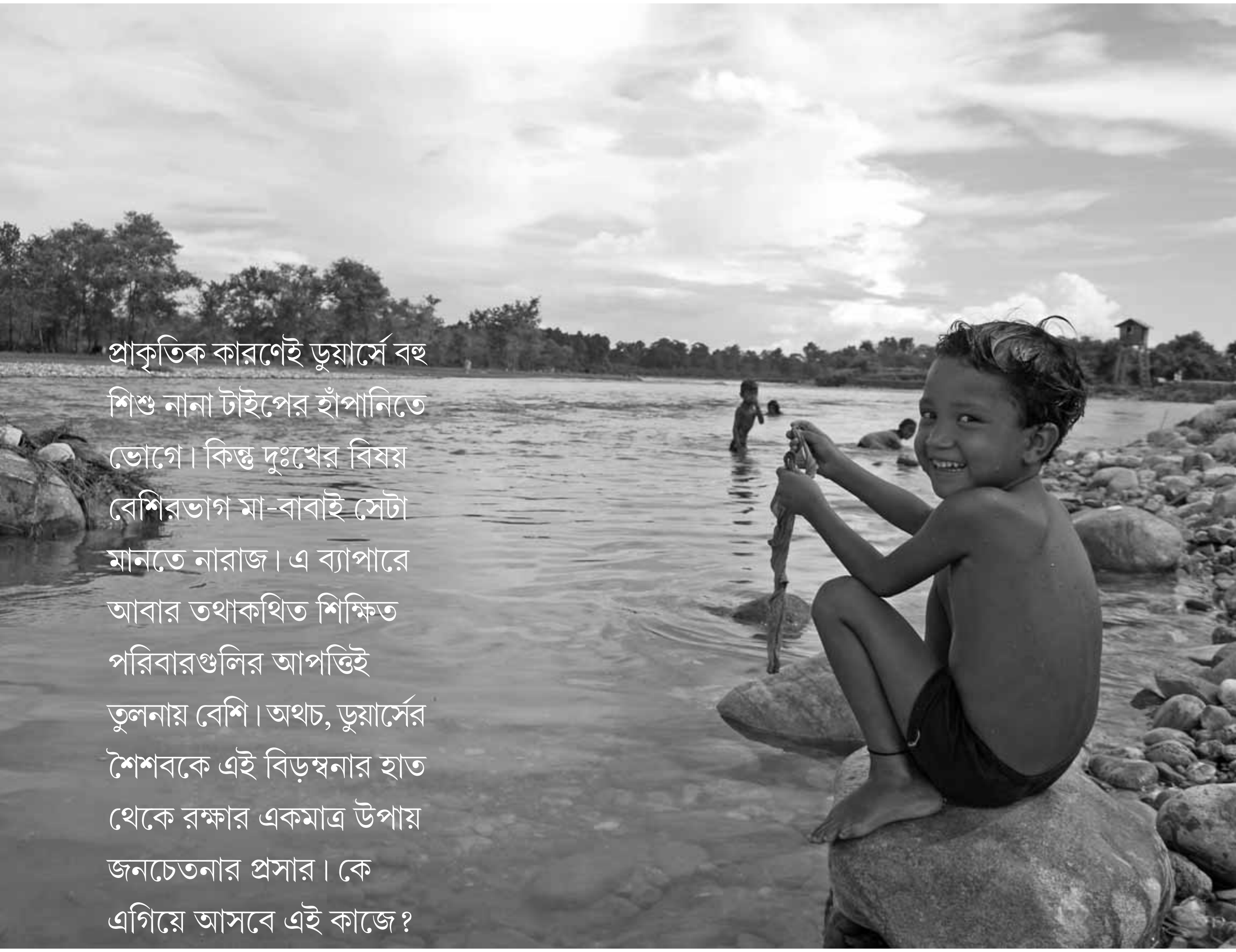

প্রাকৃতিক কারণেই ডুয়ার্সে বহু শিশু নানা টাইপের হাঁপানিতে ভোগে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বেশিরভাগ মা-বাবাই সেটা মানতে নারাজ। এ ব্যাপারে আবার তথাকথিত শিক্ষিত পরিবারগুলির আপত্তিই তুলনায় বেশি। অথচ, ডুয়ার্সের শৈশবকে এই বিড়ম্বনার হাত থেকে রক্ষার একমাত্র উপায় জনচেতনার প্রসার। কে এগিয়ে আসবে এই কাজে?

সরকারি ডাক্তার হিসেবে উত্তরবঙ্গের যে মহকুমা হাসপাতালে পোস্টিং পেয়ে এলাম, তা বেশ প্রত্যন্ত এলাকা, আমাদের পরিচিত ডুয়ার্সের ঠিক নীচের দিকে। প্রথম সাত দিনে হাসপাতালের ইনডোর, আউটডোর আর চেম্বারে রোগী দেখতে দেখতে বুঝলাম এখানকার শিশু রোগীরা বেশ বড়সড় একটা সমস্যার সম্মুখীন। প্রচুর শিশু অ্যাজমা অর্থাৎ হাঁপানি রোগে ভুগছে। দেখলাম প্রায় প্রত্যেকটি শিশুর বাড়ির লোকেরা রোগ আর সঠিক চিকিৎসা সম্পর্কে একদমই ওয়াকিবহাল নয়, হাঁপানি শব্দটি যেন এখানে নিষিদ্ধ। কোনও বাবা-মা-ই মানছে না তার শিশুর হাঁপানি আছে। মুখে উচ্চারণ করা তো অসম্ভব। এর আগে কলকাতার ডা. বি.সি. রায় শিশু হাসপাতালে পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন করার সময় আর পরে মেডিক্যাল অফিসার হিসেবে কাজ করতে করতে সাপ্তাহিক অ্যাজমা ক্লিনিক চালাতাম। শিশুদের এই রোগটি যে কত রকম ভাবে প্রেজেন্ট করতে পারে তার একটু আধটু জ্ঞান ছিলই। কিন্তু তার সবকটা ধরনই যে অতি অল্পদিনেই দেখতে পাব তা ভাবিনি। প্রথম দিনই হাসপাতালে ভর্তি এক শিশুকে দেখলাম, নাম কিন্তু বর্মণ, বয়স সাড়ে তিন বছর। প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট, বুকে সাঁই সাঁই শব্দ, কথা বলার শক্তি নেই। চারবার নেবুলাইজ করে অক্সিজেন দিয়ে প্রয়োজনীয় ইঞ্জেকশন দিয়ে রোগী কিছুক্ষণ পর স্থিতিশীল হল। ডায়াগনসিস অর্থাৎ রোগ নির্ণয় প্রক্রিয়া এক্ষেত্রে বেশিরভাগটাই ক্লিনিকাল। রোগের ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে দেখি শিশুটি এই নিয়ে তিনবার ভর্তি হয়েছে গত ছ'মাসের মধ্যে। প্রতি মাসেই কমবেশি ভোগে, ওষুধ খায়, কমে কিন্তু সারে না। শিশুর মাকে জিজ্ঞেস করলাম তোমার বাচ্চার কি রোগ আছে নাম জানো? উত্তর এল, কাশি আর বুকডা অর্থাৎ শ্বাসকষ্ট। বললাম ওটা তো রোগের নাম নয়, তোমার বাচ্চা এতদিন ধরে ভুগছে, রোগের নামটা তো তোমাকে জানতে হবে। নইলে সঠিক চিকিৎসা কী করে হবে? বাচ্চার দাদু আর বাবা উপস্থিত ছিল। দুজনেই বলল, ডাক্তারবাবু, বাচ্চাটার মাঝে মধ্যেই নিউমোনিয়া হয়। বুঝলাম এরা সবাই নিউমোনিয়া রোগের নাম জানে, কিন্তু হাঁপানি রোগের নাম শোনেনি। ভালো করে সময় নিয়ে বুঝিয়ে বললাম, তোমার বাচ্চার হাঁপানি রোগ আছে। চিকিৎসাও খুব সহজ। শিশুর

পরিবারের সবাই হাঁ হাঁ করে উঠল, না, ডাক্তারবাবু এটা হাঁপানি রোগ নয়। বুঝলাম এরা হাঁপানি রোগ সম্পর্কে জানে, কিন্তু শিশুর হাঁপানি আছে তা মানতে চাইছে না।

পরের দিনই চেম্বারে পাঁচ বছরের এক বাচ্চাকে দেখলাম, নাম অম্লান বর্মণ। মাকে জিজ্ঞেস করলাম, বাচ্চার কী অসুবিধা? ডাক্তারবাবু বাচ্চার খুব কাশি হয়, রাতে আর ভোরবেলা বেশি। সামান্য সর্দি দিয়ে শুরু হয়। প্রায় প্রতিদিনই এ রকম চলছে গত দু-তিন বছর ধরে। একটু ঠান্ডা লাগলেই কাশি শুরু। ওষুধ খেলে একটু কমে, আবার শুরু হয়, সারে না। শিশুর বাবা মা যথেষ্ট শিক্ষিত। দুজনেই স্কুল টিচার। ভালো করে হিস্ট্রি নিয়ে, পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ধীরে সুস্থে বুঝিয়ে বললাম শিশুর হাঁপানি আছে, ডাক্তারি ভাষায় চাইল্ড পারসিস্টেন্ট অ্যাজমা। আমার ডায়গনোসিস শুনে বাবা-মা বেশ বিরক্ত। উল্টে আমাকেই বোঝানো শুরু হল, না ডাক্তারবাবু, এটা হাঁপানি রোগ নয়। সে তো খুব খারাপ রোগ, তাতে শ্বাসকষ্ট হয়, একবার ধরলে আর সারে না। আমার বাচ্চার তো শুধু সর্দিকাশি, আপনি কাশির ওষুধ দেন, কমে যাবে। বুঝলাম এরা কিছুতেই মানবে না সত্যি বাস্তবটা। এরপর আর আমার চেম্বারে আসবে কিনা সন্দেহ। এর দু'দিন পরে আউটডোরে জয়রাজ বর্মণ নামে দু' বছরের এক শিশুকে দেখলাম। বাবা কর্মসূত্রে আসামে থাকে, এখানে মামাবাড়ি। মামাবাড়ি এলেই সর্দি শুরু হয়, তারপর কাশি, বুকে শব্দ আর অল্প শ্বাসকষ্ট। আউটডোরের ভিড়ের মধ্যে যেটুকু সম্ভব পরীক্ষা করে বললাম, বাচ্চার হাঁপানি রোগ, ইন্টারমিটেন্ট অ্যাজমা যা বাচ্চাটির দাদু কিছুতেই মানতে চাইল না। বলল, না ডাক্তারবাবু, এ তো অল্প ক'দিনের জন্য হয়, আবার আসাম চলে গেলেই ঠিক হয়ে যায়। এটা সাধারণ শ্বাসের রোগ, হাঁপানি নয়। বুঝলাম এই ব্যস্ততার মধ্যে একে বোঝানো বেশ মুশকিল।

এরপর চেম্বারে পেলাম দুই বোন রাধিকা খাতুন আর মৌসুমী খাতুন, পাঁচ বছর আর তিন বছর বয়সী, গরিব কৃষক পরিবারের। বাবা মা-র বক্তব্য, দুটিরই এক বছর বয়স থেকে সব সময় সর্দিকাশি লেগেই থাকে। রাতে বুকে এমন শব্দ হয় যেন বাজনা বাজে। গ্রামের ডাক্তার কিছু সিরাপ দেয়, কমে যায় আবার হয়। খুব শ্বাসকষ্ট অবশ্য এখনও হয়নি। আমি বুঝিয়ে বললাম দুটো বাচ্চারই হাঁপানি রোগ আছে। সঠিক চিকিৎসা করলে ভালো

ধীরে সুস্থে বুঝিয়ে বললাম শিশুর হাঁপানি আছে, ডাক্তারি ভাষায় চাইল্ড পারসিস্টেন্ট অ্যাজমা। আমার ডায়গনোসিস শুনে বাবা-মা বেশ বিরক্ত। উল্টে আমাকেই বোঝানো শুরু হল, না ডাক্তারবাবু, এটা হাঁপানি রোগ নয়। সে তো খুব খারাপ রোগ, তাতে শ্বাসকষ্ট হয়, একবার ধরলে আর সারে না। আমার বাচ্চার তো শুধু সর্দিকাশি, আপনি কাশির ওষুধ দেন, কমে যাবে।

থাকবে। হাঁপানি কথাটায় একটু আপত্তি তুললেও বাবা-মা আমার কথা ভালো করে শুনল। বলল, আমরা আরও দু-তিনজন বড় ডাক্তার দেখিয়েছি, কেউ তো হাঁপানি রোগই আছে ভালো করে বলেননি। বুঝলাম আমাদের অর্থাৎ ডাক্তারদের মধ্যেও কোথাও নিশ্চয়ই একটা খামতি আছে এক্ষেত্রে। সঠিকভাবে বোঝাতে পারি না, নাকি সময় নেই, নাকি ইচ্ছে করেই বলি না।

এর পরের অভিজ্ঞতা বেশ মর্মান্তিক। রাত বারোটায় হাসপাতাল কোয়ার্টারে ঘুম ভেঙে উঠে যে বাচ্চাটিকে দেখলাম, লিটন বিশ্বাস, চার বছর বয়সী, বেশ শ্বাসকষ্ট, বুকে সাঁই সাঁই শব্দ, দূর থেকেই শোনা যাচ্ছে, স্টেথো বসাবার দরকার হয় না। কোনও পরীক্ষা নিরীক্ষা না করে, দেখেই সহজে বলে দেওয়া যায় অ্যাজমা। শিশুর বাবা মা শিক্ষিত, চাকরি করেন। আমাদের হাসপাতালের এক সিস্টার দিদিমণির আত্মীয়। সামান্য দু-চার কথায় জানতে পারলাম, দেড় বছর বয়স থেকে শিশুটি ভুগছে। প্রায়ই শ্বাসকষ্ট হয় কিন্তু এতটা বাড়াবাড়ি নাকি কোনওদিন হয়নি। অভিভাবকদের বুঝিয়ে বললাম 'অ্যাকিউট এক্সাসারবেশম অব মডারেট পার্সিস্ট্যান্ট অ্যাজমা'। অ্যাজমা নাম শুনে তাঁদের তীব্র আপত্তি, না ডাক্তারবাবু এটা হাঁপানি রোগ নয় অন্য কিছু। এর আগে অনেক ডাক্তার দেখিয়েছি। দু'জন ডাক্তার অবশ্য বলেছেন হাঁপানি হতে পারে, কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি না। পুরানো প্রেসক্রিপশনগুলো দেখলাম। গত দু'বছরে ছ'জন ডাক্তার দেখানো হয়েছে পাল্টে পাল্টে। অর্থাৎ আমরা যাকে বলি মেডিক্যাল শপিং। যা হোক এখন আপাতত হাসপাতালে ভর্তি করে নেবুলাইজ করতে হবে, নইলে শ্বাসকষ্ট কমবে না। কিন্তু নেবুলাইজ করতেও মার আপত্তি। ওই গ্যাস দিলে নাকি বাচ্চার ক্ষতি হয়। আর একবার দিলে সারা জীবন দিতে হবে। ডাক্তারবাবু, একটা ইঞ্জেকশন বা কোনও ওষুধ দিয়ে শ্বাসকষ্ট কমান। অনেকবার মাকে বোঝান হল, ওটা গ্যাস নয়, ওষুধ। যেমন ট্যাবলেট, ক্যাপসুল বা সিরাপ ওষুধ হয় তেমনই ওটা গ্যাসের আকারে ওষুধ। এটাই আধুনিক এমনকি অ্যাজমার একমাত্র চিকিৎসা। যাইহোক বুঝিয়ে-সুজিয়ে বাচ্চাকে নেবুলাইজ করে সুস্থ করা গেল। এরপর তাঁরা বললেন, আমাদের কলকাতায় কোনও বড় ডাক্তারবাবুর ঠিকানা দিন, দেখাব। অর্থাৎ আবার মেডিক্যাল শপিং। আমার মতো ডাক্তারের কথায় বিশ্বাস নেই। অগত্যা ডা. কে কে ঘোষের ঠিকানা দিলাম। আমাদের সিনিয়র, শিশুদের অ্যাজমা স্পেশালিস্ট। তাঁর চিকিৎসা পদ্ধতির একটি বিশেষ দিক এক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

প্রতিরোধ হিসেবে জনচেতনা আর সেক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে সরকারি ও বেসরকারি শিশু-চিকিৎসকদেরকেই।

প্রথম দেখা কোনও শিশু রোগীর অ্যাজমা ডায়গনসিস হয়ে গেলে তিনি লাল কালিতে প্রেসক্রিপশনে বড় করে লিখে দেন 'শিশুর হাঁপানি রোগ আছে।' এটা বার বার দেখতে দেখতে অভিভাবকদের মনে নিশ্চয়ই বাস্তব মেনে নিতে একটু অন্তত সুবিধা হয়। আমার নিজস্ব মত হল, আমাদের মতো প্রত্যেক শিশু চিকিৎসকের এইটুকু সাহসী হওয়ার প্রয়োজন আছে।

প্রথম একমাসে এত অ্যাজমা রোগী দেখলাম যে বুঝতে অসুবিধা হয় না, ডুয়ার্স আর সন্নিহিত অঞ্চলে কী বিশাল সংখ্যক শিশু এই রোগে ভুগছে। আমি যা দেখি তা তো হিমশৈলের চূড়া মাত্র। জনঘনত্বে দক্ষিণের তুলনায় উত্তরবঙ্গ হয়তো পিছিয়ে, কিন্তু অ্যাজমা ঘনত্বে নিশ্চয়ই অনেক এগিয়ে। এর কারণ খুঁজতে খুঁজতে মনে হয়েছে, ডুয়ার্সের বছরভর শীতল স্যাঁতসেতে আবহাওয়া নিশ্চয়ই একটা কারণ। গ্রামাঞ্চলে প্রচুর মানুষের টিনের দেওয়াল টিনের চালের বাড়ি, অনেক বাড়ি ছোট বড় নানা নদীর পাড়ে। নদীর ধারে ঠান্ডা হাওয়া কি একটা কারণ হতে পারে? খোঁজ নিয়ে দেখেছি অনেক বাচ্চা নদীতে স্নান করে। এ প্রসঙ্গে একটা উদাহরণ দেওয়া দরকার। আমার হাসপাতালের সামান্য দূরে জনবসতি, নদীর পাড় বেঁধে দাসপাড়া, স্থানীয় নাম মাছুয়াডারি। এ পাড়ায় বেশিরভাগ লোকের মাছ ধরা জীবিকা বলে বোধ হয় এ রকম নাম। এই দাসপাড়ায় বাচ্চার সংখ্যা যথেষ্ট বেশি। আর

প্রথম দেখা কোনও শিশু রোগীর অ্যাজমা ডায়গনসিস হয়ে গেলে তিনি লাল কালিতে প্রেসক্রিপশনে বড় করে লিখে দেন 'শিশুর হাঁপানি রোগ আছে।' এটা বার বার দেখতে দেখতে অভিভাবকদের মনে নিশ্চয়ই বাস্তব মেনে নিতে একটু অন্তত সুবিধা হয়।

খুব আশ্চর্যজনক ব্যাপার, এক থেকে ছ'বছর প্রতিটি বাচ্চারই কোনও না কোনও একটি টাইপের অ্যাজমা আছে। প্রায় প্রতিদিনই এ পাড়ার কোন না কোনও শিশু হাসপাতালে ভর্তি হয়। এই শিশুদের বাবা-মাকে বোঝানোর সময় আমি মজা করে বলি, এই রোগের নাম 'দাসপাড়ার হাঁপানি'।

প্রথম থেকেই তাই চেম্বারে, ইন্ডোরে, আউটডোরে এরকম শিশু পেলে আমার প্রথম দায়িত্ব হল, বাবা মাকে ভালো করে বোঝানো, কারণ অ্যাজমা কন্ট্রোলের প্রধান ব্যাপারই হল অ্যাজমা অ্যাওয়ারনেস। রোগের প্রকৃতি কী, চিকিৎসা আর কী সাবধানতা, সেগুলো বোঝাতে হয় বার বার। কারণ শুধু ওষুধ খাইয়ে, নেবুলাইজার করে, স্পেলার মাস্ক দিয়ে ইনহেলার চিকিৎসায় তো এ রোগ সারবে না। সুতরাং হাসপাতালে, চেম্বারে সেই কাজটাই করা শুরু করলাম। অ্যাজমা অ্যাওয়ারনেস। যে মায়েরা বাচ্চা নিয়ে বার বার দেখায়, হাসপাতালে ভর্তি হয়, তাদের কঠোর সুরেই বলি, বলো আমার বাচ্চার হাঁপানি রোগ আছে, ইনহেলার বা গ্যাস নিলে বাচ্চা ভালো থাকবে। একবার নয়, তিনবার এই কথা বল। এই কাজ এখনো করে যাচ্ছি প্রতিদিন। কিছু ফল নিশ্চয়ই পেয়েছি। গ্রামের গরীব মানুষেরা অনেকেই দামী স্পেলার, মাস্ক, ইনহেলার কিনতে পারেনি, আবার অনেকেই পয়সা জমিয়ে তা কিনেছে। হীরা বর্মণ, সঙ্গা অধিকারি, পীনাথ বর্মণ নামের যে শিশুরা আগে ঘন ঘন আসত, তাদের আর দূরে আসতে হচ্ছে না, বাড়িতে বসেই চিকিৎসা চলছে, সুস্থ আছে। অভিজ্ঞতায় দেখেছি গ্রামের গরীব মায়েদের হাঁপানি শব্দটা উচ্চারণে আর ততটা আড়ষ্টতা নেই, যতটা এখনও আছে তথাকথিত শিক্ষিত শহুরে মায়েদের মধ্যে। আরো অনেক অভিজ্ঞতা হয়। সব তো আর লিখে শেষ করা যায় না। আরো অভিজ্ঞতা হবে নিশ্চয়ই, সেই আশায় থাকি। ডুয়ার্সের শিশুদের এই রোগ নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা, আরো পড়াশোনা, চিকিৎসকদের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময় ইত্যাদির প্রয়োজন আছে। কিন্তু বাস্তবে সে সুযোগ আর সময় পাওয়া যায় না।

পরিশেষে বলি শিশুদের যে নামগুলো লেখা হয়েছে, তারা সবাই হয়তো অ্যাজমা রোগী নয়, হয়তো অন্য রোগ নিয়ে আমার কাছে এসেছিল, কিন্তু কোনও নামই কাল্পনিক নয়। আসলে বাচ্চাদের এই রকম নাম আমি দক্ষিণবঙ্গে কোনও দিন পাইনি, উত্তরে এসে প্রথম জানলাম। ভীষণ মিষ্টি মিষ্টি সেই নামগুলো তাই পাঠকদের জানাবার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না।

ডা. শান্তনু মাইতি

ছবি : পূষণ দেবমল্লিক

যুগান্তের প্রতীক্ষায় সীমান্ত শহর জয়গাঁ

বহু যুগের বঞ্চনা কাটিয়ে গা-ঝাড়া দিতে চলেছে সীমান্ত শহর জয়গাঁ। স্মার্ট সিটির হাতছানি নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখাচ্ছে বাসিন্দাদের।

ডুয়ার্সের মানুষের জন্য এ যেন এক যুগান্তকারী বার্তা। নতুন জেলা আলিপুরদুয়ার উপহার মেলার কয়েকদিনের মধ্যেই এখানকার মানুষ জানতে পারলেন দ্বিতীয় উপহারের খবর। দেশের অগ্রগতির প্রয়োজনেই দ্রুত শহরের সংখ্যা বাড়ছে, সেই সঙ্গে বাড়ছে শহরের পরিকাঠামো নির্মাণের তৎপরতা। সে কথা মাথায় রেখে দেশের নানা প্রান্তে শ'খানেক আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর 'স্মার্ট সিটি' গড়ার পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। আর তার প্রথম পর্যায়েই আছে জয়গাঁর নাম। দীর্ঘ অবহেলা, ঔদাসীন্য, বঞ্চনার ফলস্বরূপ যাবতীয় অজ্ঞতা ও অপরাধের অন্ধকারে ডুবে থাকা জনপদটি হঠাৎ যেন কোনও রূপকথার জীয়ন কাঠির জাদুস্পর্শে যাবতীয় ভোল পাল্টে নতুন রূপ পেতে চলেছে। ব্যস, আর কিছুদিনের অপেক্ষা। তারপর যেন হাজার বছরের জরার হাত থেকে মুক্তি। নতুন আলোয় সাজবে জয়গাঁ, তথ্য ও প্রযুক্তির আধুনিকতম পরিচালনায় চলবে শহর। ট্রাফিক কন্ট্রোল থেকে গ্যাস-ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই, ব্যাংকের টাকা জমা-তোলা থেকে বাড়িতে দুধের বোতল সব কিছুই চলবে কম্পিউটারের অঙ্গুলিহেলনে, মায় শহরের ঢোকা-বেরনো কিংবা রাত্রিবাসের অনুমতিও। জয়গাঁর হাল-হকিকত সম্পর্কে যাদের সামান্যতম ধারণা আছে, তাদের পক্ষে অবশ্য 'স্মার্ট সিটি' হিসেবে জয়গাঁর পরিবর্তন কল্পনা করাটাও কষ্টকর। কারণ বাস্তবের চিত্রটা একেবারেই অন্য রকম।

উত্তরবঙ্গের স্থানীয় সংবাদপত্রের পাতায় একটি খবরের দুটি লাইন বহু মানুষেরই স্বাভাবিকভাবেই চোখ এড়িয়ে যায়, আবার বহু পাঠকের কাছে সেটি মামুলি খবরই মনে হয়। কারণ, এই ধরনের মাঝারি-ছোট-বড় খবর হামেশাই কাগজে চোখে পড়ে তাদের। দলগাঁও, হাসিমারা, হ্যামিলটন, মাদারি, কালচিনি, এসব এলাকায় মাঝেমধ্যে পুলিশ একটু সক্রিয় হয়ে উঠলেই ধরা পড়ে থরে থরে আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র, গোলা-বারুদ। কাদের প্রয়োজন হচ্ছে এসব অস্ত্রের? পুলিশের সোজাসাপ্টা উত্তর হল — ডাকাতদের, রাজনৈতিক নেতাদের, ব্যবসায়ীদের, ছোট বড় মস্তানদের সবার। কারও পেশাগত সুবিধায়, কারও বা আত্মরক্ষার জন্য। কিন্তু কোথায় চলছে এর অবাধ বিপণন? কোন বাজারের এঁদোগলিতে বা মহল্লায়? এবার পুলিশের অঙ্গুলি সংকেত ভুটান সীমান্ত সংলগ্ন পুরনো আধা শহর— জয়গাঁর দিকে। একটা সময় উলফা বা তারপরে কে এল ও আন্দোলনের জঙ্গিদের আশ্রয় বা সীমান্ত পারাপারের সুবিধার জন্য ভৌগোলিক অবস্থানের কারণেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল এই জয়গাঁ। আজ কেউ যদি আশংকা প্রকাশ করে বসেন, পুরনো উগ্রপন্থা আবার ফিরে-টিরে আসছে না তো, তবে তার উত্তরে গ্যারান্টি দিয়ে 'না' বলার ক্ষমতা কি উত্তরবঙ্গের কোনও রাজনৈতিক নেতার বা অভিজ্ঞ কোনও পুলিশ কর্তার আছে? কী বলছে 'ইনটেলিজেন্স'? উত্তরবঙ্গের বরিষ্ঠ রাজনীতিবিদদের যুক্তি অকাট্য, বঞ্চনা-অবহেলার ধারা যেখানে আজও বহাল সেখানকার বাতাসে বারুদের গন্ধ পেতে আলাদা করে 'ইনটেলিজেন্স'-এর প্রয়োজন হয় না। উগ্রপন্থা বা দস্যুবৃত্তি যাই হোক না কেন, উত্তরবঙ্গের নির্মল বাতাসে নিঃসন্দেহে ছড়ায় বারুদের বিষ।

বেআইনি অস্ত্রের মতোই উত্তরবঙ্গকে ক্রনিক রোগের মতো ভোগায় অবৈধ অনুপ্রবেশ এবং বলাই বাহুল্য, অনুপ্রবেশকারীদের বৃহদাংশের প্রাথমিক নিরাপদ আশ্রয়স্থল এই জয়গাঁ। এককালে ভুটান থেকে সমূলে বিতাড়িত হয়ে বর্ডার পেরিয়ে জয়গাঁতে আস্তানা গেড়েছিল নেপালি সম্প্রদায়ের মানুষ। রাজ্যের অন্যান্য সীমান্তের মতোই উত্তরের সীমান্তেও অনুপ্রবেশ আজও বহাল। অনুপ্রবেশকারীদের কিছু অংশ ছড়িয়ে পড়ে দেশের নানা প্রান্তে, আর কিছু স্থানীয় এলাকাতেই ঘোরঘুরি করে নিশ্চিন্ত ডেরার খোঁজে। আর সেই নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে পায় জয়গাঁ সীমান্তে। প্রশাসনের নাকের ডগাতেই পেট চালাবার জন্য এই অনুপ্রবেশকারীরা বেছে নেয় অবৈধ সব কার্যকলাপ— মাদক পাচার, দেহ ব্যবসা, কাঠ চোরাই, রাহাজানি, তথ্যপাচার, নাশকতা ইত্যাদি ইত্যাদি।

আজ ফুন্টশোলিং তথা ভুটান বেড়াতে গিয়ে কোনও রকমে এপারের যে অংশটুকু পেরিয়ে ঢুকে পড়ি ভিনদেশের আঙিনায়, সেই অংশটি মূলত ঘিঞ্জি, যত্রতত্র গড়ে ওঠা একটি আধাবস্তি আধাশহর, যেখানে দিনে রাতে চলে যাবতীয় বেআইনি কারবারের রমরমা, যার অলিখিত অথচ শক্তিশালী নেটওয়ার্ক ছড়িয়ে আছে উত্তরবাংলার নানা প্রান্তে। অথচ কে বলবে বা ক'জন জানে যে, রাজস্ব আদায়ের হিসেবে জয়গাঁর স্থান

১৯৯০ সালে জলপাইগুড়ি জেলার কালচিনি ব্লকের ভুটান সীমান্ত লাগোয়া গুটিকয়েক চা বাগান ও আদি জনজাতির বসতি সহ ৪৬ বর্গ কিমি জায়গা নিয়েশুরু হয় জয়গাঁ ডেভলপমেন্ট অথরিটি, পশ্চিমবঙ্গের ষষ্ঠ নগর উন্নয়ন প্রকল্প। উদ্দেশ্য যথেষ্ট মহৎ— ভৌগোলিক অবস্থানের হিসেবে জয়গাঁকে একটি আধুনিক সুযোগসুবিধা সম্বলিত পূর্ণ শহরে পরিণত করা। অথচ যেখানে ৯৫ শতাংশ জমিই সরকারি, যা কুড়ি বছরেও ভূমি দপ্তর বাসিন্দাদের নামে জারি করে উঠতে পারেনি, যেখানে এই দীর্ঘ সময়েও তৈরি হয়নি উন্নয়নের কোনও মাস্টার প্ল্যান।

শিলিগুড়ির পরেই এবং বছর দশেক আগেই সরকারিভাবে জয়গাঁকে 'স্থল বন্দর' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে? কিন্তু কোনও দুরূহ অজ্ঞাত কারণে বছরের পর বছর এই জয়গাঁ অবহেলিত, উপেক্ষিত থেকে গেছে। হাতে গোনা কিছু অসাধুর স্বার্থসিদ্ধির জন্য লোকচক্ষুর আড়ালে বছরের পর বছর জায়গাটিকে রীতিমত ভাগাড়ে পরিণত করা হয়েছে।

আজ থেকে চব্বিশ বছর আগে, ১৯৯০ সালে জলপাইগুড়ি জেলার কালচিনি ব্লকের ভুটান সীমান্ত লাগোয়া গুটিকয়েক চা বাগান ও আদি জনজাতির বসতি সহ ৪৬ বর্গ কিমি জায়গা নিয়েশুরু হয় জয়গাঁ ডেভলপমেন্ট অথরিটি, পশ্চিমবঙ্গের ষষ্ঠ নগর উন্নয়ন প্রকল্প। উদ্দেশ্য যথেষ্ট মহৎ— ভৌগোলিক অবস্থানের হিসেবে জয়গাঁকে একটি আধুনিক সুযোগসুবিধা সম্বলিত পূর্ণ শহরে পরিণত করা। এর বছর কয়েক আগেই চালু হয়েছিল শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি ডেভেলপমেন্ট অথরিটির কাজ, যেখানে বাম আমলে শয়ে শয়ে কোটি টাকা খরচ হয়েছে, ডেভেলপমেন্ট অথরিটি বিস্তার লাভ করেছে প্রায় মালবাজার অবধি। অথচ এই জলপাইগুড়ি জেলারই আরেক অংশে জয়গাঁ ডেভেলপমেন্ট অথরিটির হাল গত একুশ বছর ধরে রয়ে গেছে অনাথ সন্তানের মতো, একচুলের হিসেবে ধরলেও উন্নয়নের কিচ্ছুটি হয়নি। রাস্তাঘাট, স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল বলতে যা আছে তা আজ না থাকারই নামান্তর। বছরে যেটুকু ছিটেফোঁটা অনুদান আসত, তা ভাগাভাগি হয়ে যেত রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষী নেতাদের মধ্যে। ২০০৩ সালে জয়গাঁকে 'ল্যান্ড পোর্ট' হিসেবে ঘোষণা করলেও অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয়নি। অথচ পাশেই আরেকটি ল্যান্ড পোর্ট ফুলবাড়ির চেহারা এর মধ্যে কতটা বদলেছে তা স্বচক্ষে গিয়ে দেখা যায়। জয়গাঁর পরে ডেভেলপমেন্ট অথরিটি গঠন হয়েছে বর্ধমান, মেদিনীপুর-খড়গপুর এবং দীঘার জন্য। বলাই বাহুল্য, সেখানেও গত কয়েক বছরে উন্নয়নের কাজ যেটুকু চোখে পড়েছে তার ছিটেফোঁটাও হয়নি জয়গাঁতে। স্থানীয় মানুষদের কথায়, না হওয়ার কারণ অতি স্বচ্ছ ও পরিষ্কার। দীর্ঘমেয়াদি ক্ষমতা ভোগের অভিজ্ঞতায় বাম নেতারা এটুকু বুঝেছিলেন যে, উন্নয়ন নয়, সমস্যা জিইয়ে রাখাই শাসনের সহজ পদ্ধতি। অপরাধ জগৎ চালু থাকলে রোজগার অনেক বেশি সুগম হয়।

সেই অচলায়তনের অবশেষে একদিন সমাপ্তি ঘটেছে। নয়া জমানায় সেই জয়গাঁ ডেভেলপমেন্ট অথরিটির দায়িত্ব পান মিহির গোস্বামী। রাজনৈতিক নেতা হিসেবে পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তির জন্য উত্তরবঙ্গের মানুষের কাছে যিনি পরিচিত। দায়িত্ব নিয়েই মিহিরবাবুর বিস্মিত মন্তব্য ছিল— যেখানে ৯৫ শতাংশ জমিই সরকারি, যা কুড়ি বছরেও ভূমি দপ্তর বাসিন্দাদের নামে জারি করে উঠতে পারেনি, যেখানে এই দীর্ঘ সময়েও তৈরি হয়নি উন্নয়নের কোনও মাস্টার প্ল্যান, সেখানে ডেভেলপমেন্ট অথরিটির প্রাসঙ্গিকতা বা প্রয়োজনীয়তা নিয়েই তো প্রশ্ন ওঠে।

সম্প্রতি তিন বছরের কার্যকাল সমাপ্তির শেষে মিহিরবাবুর গলায় স্বস্তির আভাস, অবশেষে ডেভেলপমেন্টের প্রথম পদক্ষেপটুকু নেওয়া গেছে। গত তিন বছরের ক্রমাগত প্রচেষ্টার পর মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে শুরু হয়ে গেছে ল্যান্ড সেটলমেন্টের কাজ। দীর্ঘদিনের অধিবাসী যেমন হাতে পাবেন বাসভূমির মালিকানা, তেমনই ব্যবসায়ীদেরও স্থায়ী ঠিকানা হওয়ায় যাবতীয় বাণিজ্যিক সুবিধা মিলবে। আর এই নাম জারির কাজ শেষ হলে সরকারের রাজস্ব আয় হবে ১০০ কোটি টাকারও বেশি।

কেবল তাই নয়, যে কোনও ডেভেলপমেন্ট অথরিটির উদ্দেশ্য সাধনের আরেকটি বড় বাধা ছিল— কলেবরে শহরের চেহারা নিলেও এতদিন জয়গাঁ ছিল পঞ্চায়েতের অধীনে। অথচ পৌরসভার কাঠামো না থাকলে সেখানে নগর উন্নয়নের কাজই শুরু সম্ভব নয়। সেদিকেও বেশ খানিকটা এগনো গেছে। জয়গাঁ শীঘ্রই পৌরসভায় উন্নীত হওয়ার পথে। আর পরিকাঠামো বলতে কিছুই ছিল না এখানে। গত তিন বছরে যেটুকু ফান্ড এসেছে তার সিংহভাগই খরচ হয়েছে রাস্তা নির্মাণে, নিকাশী ব্যবস্থায়, কালভার্ট ও ব্রিজ নির্মাণে। কলেজের বিল্ডিং, বাউন্ডারি-গেট নির্মাণে খরচ হয়েছে বেশ খানিকটা। সাধারণ মানুষের পানীয় জলের জন্য কিছু গভীর নলকূপের ব্যবস্থা হলেও তা যথেষ্ট নয়। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরে দেওয়া হয়েছে ৬০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প। যাতে তোর্সা নদীর জল পরিস্রুত হয়ে অন্তত দু'লাখ মানুষের পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে পারে। এছাড়া নগর উন্নয়ন দপ্তরের বরাদ্দ আড়াই কোটি টাকা ব্যয় করা হবে মিনি মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরির কাজে। নিযুক্ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রযুক্তি বিভাগের গবেষক-বিশেষজ্ঞদের দীর্ঘদিনের স্টাডি রিপোর্ট আসতে শুরু করে দিয়েছে।

মিহিরবাবুর খেদোক্তি, সীমিত সাধ্যের মধ্যে যতটুকু সম্ভব করা গেছে। তবে আশার কথা হল, এখানকার দীর্ঘদিনের বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে ভরসাটুকু জাগানো গেছে। আজ যখন 'স্মার্ট সিটি'র প্রথম তালিকায় জয়গাঁর নাম উচ্চারিত হয় তখন তাঁদের সেই ভরসাই পরিণত হয় উজ্জ্বল স্বপ্নে। যেখানে যাবতীয় গ্লানি দুর্দশা অন্ধকার ঘুচে যাবে, মাথা উঁচু করে বাঁচবে সবাই। গত তিন বছরের এই সব উদ্যোগ ও প্রচেষ্টাকে সেই স্বপ্ন নির্মাণের সিঁড়ি বলা যায় নিঃসন্দেহে। জয়গাঁর মানুষ তো বটেই, গোটা ডুয়ার্স তাকিয়ে আছে সেই দিকেই।

নিজস্ব প্রতিনিধি

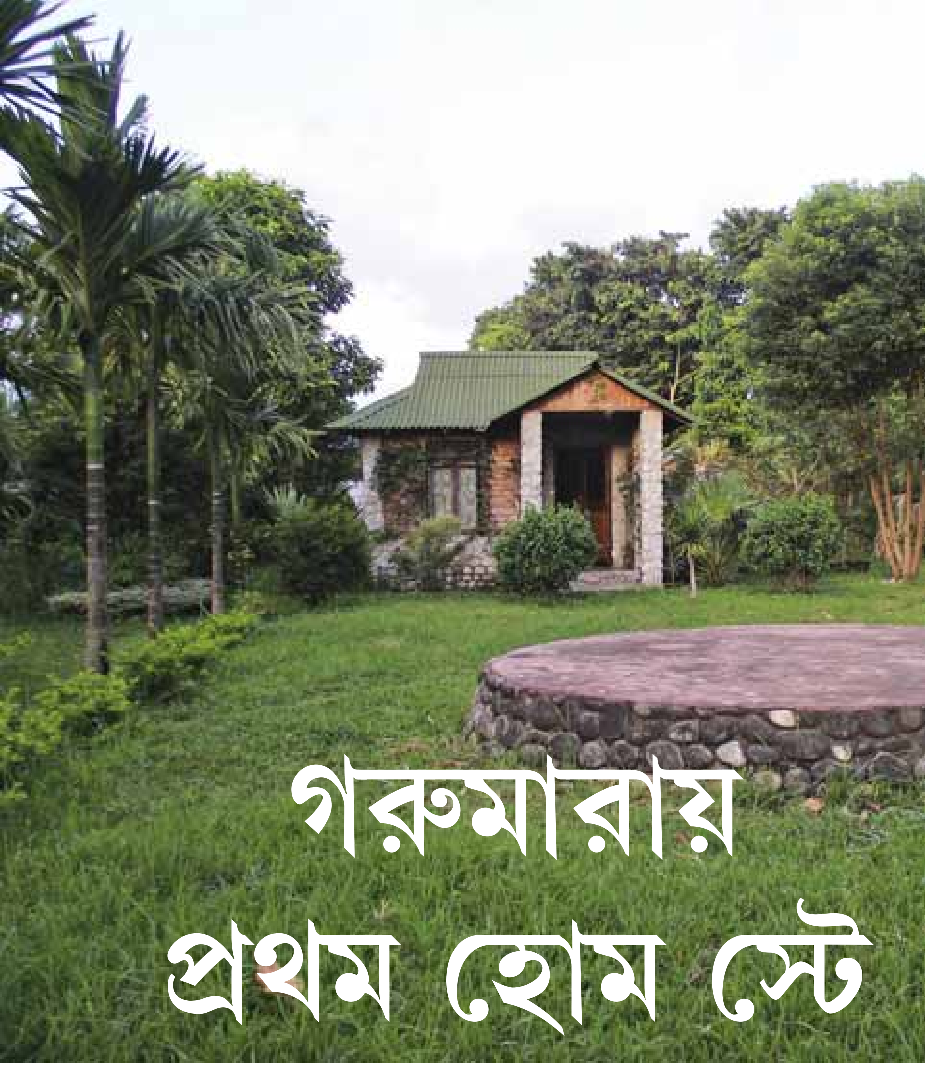

গরুমারায় প্রথম হোম স্টে

গরুমারা ন্যাশনাল পার্ক লাগোয়া প্রথম হোম স্টে। বাংলায় বললে ঘরোয়া পর্যটন। বনের পাশে মানুষের তৈরি উপবন। জঙ্গল-পাহাড়-নদী সংলগ্ন কোনও পারিবারিক আতিথেয়তায় থেকে কয়েকটা দিন প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় সান্নিধ্য উপভোগ করা — আজ এবং আগামী দিনের শহুরে মধ্যবিত্ত বাসিন্দাদের একমাত্র আকাঙ্খা বলা যায় নিঃসন্দেহে। কারণ দৈনন্দিন রুটিনের বেড়াজালে দিনের পর দিন আর স্কোয়ার ফিটের বাতানুকুল শয়নকক্ষে রাতের পর রাত কাটিয়ে ক্লান্ত হওয়ার রোগ তো কেবল তাদেরই হয়।

ডুয়ার্স নিয়ে কোনও শহুরে বাঙালির আজ আর আলাদা করে পরিচয় দেওয়ার কিছু নেই। চা বাগান, গভীর অরণ্যের বুক চিরে পাথুরে খরস্রোতার বয়ে যাওয়া, মেঘের আড়ালে সবুজ পাহাড়ের ঢেউ আর তারও ওপার থেকে বরফে ঢাকা গিরিশৃঙ্গের হাতছানি, গাছ পাখি ও বন্যপ্রাণের বৈচিত্র্য ডুয়ার্সকে সেই কবে থেকে অনন্য করে রেখেছে। এখানেই বাংলার ছ'টি ঋতু যেন আলাদা আলাদা করে ধরা পড়ে। গ্রীষ্মের

প্রখরতা বা শীতের প্রকোপে বাকিরা অর্থাৎ বর্ষা-শরৎ-হেমন্ত-বসন্ত এরা হারিয়ে যায় না। ডুয়ার্সে তাই বেড়াতে আসা যায় বছরভর।

গরুমারা ন্যাশনাল পার্কে বন্যপ্রাণ দপ্তরের ইকো পর্যটন উদ্যোগ ডুয়ার্সকে নতুন পরিচয় দিয়েছিল। দেশের সেরা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের স্বীকৃতি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডুয়ার্সের এই প্রান্তেও অর্থাৎ লাটাগুড়িকে কেন্দ্র করে জমে উঠেছিল পর্যটন। স্থানীয় মানুষের তৈরি রিসর্টের পাশাপাশি বাইরের ব্যবসায়ীরাও জমি কিনে রিসর্ট তৈরি করেছিল। সিজন টাইমে উপচে পড়া ভিড় থাকে এইসব রিসর্টগুলিতে।

এইসব রিসর্টের ভিড় থেকে খানিকটা দূরে নিরিবিলি পরিবেশ খুঁজে নিন 'উপবন'। গাছগাছালি ঘেরা মনোরম পরিবেশে ঘাসের ছাউনি আর মাটির প্রলেপ দেওয়া নেচার হাট, তার আভ্যন্তরীণ আবহাওয়া উষ্ণতা ও আর্দ্রতার ভারসাম্য রাখে যা স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল। একবার গেট খুলে ভেতরে ঢুকে পড়তে পারলেই হল, পরিবেশ এক নজরে মন কেড়ে নেয়। সেই সঙ্গে আছে আতিথেয়তার বাড়াবাড়ি। অর্গানিক চাষে ফলানো শাকসবজি, দিশি মুরগি ও তার ডিম, নদীর তাজা ছোট মাছ খাদ্যরসিকের রসনা তৃপ্ত করে, বারবার টেনে নিয়ে আসে এইখানে।

আর বেরিয়ে পড়তে চাইলে তো কথাই নেই। হুড খোলা জিপে বেরিয়ে পড়ুন নদী জঙ্গল পাহাড়ের স্পর্শ অনুভব করতে। এছাড়া বাইসাইকেল আর পায়ে হেঁটে তো আছেই। কাছেপিঠে কিংবা দূরে কোথাও সব ব্যবস্থাই রয়েছে। অ্যাডভেঞ্চার প্রেমিদের জন্য প্যারাগ্লাইডিং বা রিভার র‍্যাফটিংয়ের ব্যবস্থাও হতে পারে। আর যারা প্রকৃতির মাঝখানে থেকে শরীর ও মনকে চাঙ্গা করে নিতে চান তাদের জন্য নিয়মিত যোগ ব্যায়াম ও প্রাণায়ামের ব্যবস্থা করা হয়।

উপবনে থাকা ও খাওয়া বাবদ রোজকার মাথাপিছু খরচ ১২৫০ টাকা। কলকাতা থেকে বুকিং করবার জন্য ফোন ৯৮৩০৪১০৮০৮।

রকি আইল্যান্ড

ট্রেকারটা লাফিয়ে লাফিয়ে নামছে পাথুরে রাস্তা দিয়ে। তিনদিকে ঘন সবুজ পাহাড় আর একদিকে সমভূমির অসীম বিস্তার বহুদূরে কোথায় যেন আকাশের গায়ে হারিয়ে গেছে। নিচে বিভাজিকার মাঝ দিয়ে এঁকেবেঁকে পাথরে শতচ্ছিন্ন হতে হতে বয়ে চলেছে চঞ্চল মূর্তি নদী। এখানে পাথর, পাহাড় আর জঙ্গল যেন বেঁধে রেখেছে মূর্তিকে। সামসিং যাওয়ার রাস্তা ফেলে ডানদিকে ঘুরে আমরা নেমে চলেছি পাহাড়ের গভীর খাঁজে, সেই মূর্তির জল ছুঁতে।

শেষ দুপুরে গন্তব্যে এসে খিদে ভুলে গেলাম। বড় বড় পাথরের উপর দিয়ে একটু কসরত করে নামতে পারলেই মূর্তির ঠান্ডা জলে পা ভেজানো যাবে। চারদিকে উঁচু পাহাড়, শিরশিরে ঠান্ডা। অল্প কয়েক ঘর স্থানীয় লোকজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে। এই নদী ধরে কিছুটা উজান পানে চললেই ঢুকে পড়া যাবে ঘন রহস্যাবৃত ন্যাওড়া ভ্যালিতে। পাহাড় থেকে নেমে তারুণ্যের উচ্ছলতায় এ-পাথর ও-পাথর ডিঙিয়ে ফেনা তুলে চলেছে নদী আপন খেয়ালে, আর তার ধারে পাথরে পা ঝুলিয়ে বসে ভাত-ডাল-মাছে মধ্যাহ্নভোজ আর ভজনদার আন্তরিকতা এমন পরিবেশের সৌন্দর্যকে অন্য মাত্রা এনে দিল।

সন্ধ্যা গড়িয়ে রাতের দিকে চলল। নিকষ কালো আঁধারে আকাশ পাহাড় যেন মিশে

এমন স্বপ্নের দেশেও গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে বাতাস গরম হয়। নাগরিক চাওয়া-পাওয়া খিদে-তৃষ্ণা ভুলিয়ে দেওয়া এমন দেশকে আমরা যখন বিদায় জানাচ্ছি তখনও এই অনাবিল প্রকৃতি পিছু ডাকছে।

গেল। কালো পাহাড়ের গায়ে দূরে দূরে দু'-একটা আলোর বিন্দু জানান দিচ্ছে এই পাহাড় জঙ্গলের মাঝে মানুষের নিঃসঙ্গ বিচ্ছিন্ন উপস্থিতি। উপরে তারা ভরা আকাশ। নীচ থেকে একটানা বয়ে চলা নদী আর ঝিঁ ঝিঁ-র প্রবল কলতান মিলে মিশে একাকার। খাদের ধার ঘেঁষে টিনের শেডের তলায় মোমের মৃদু আলোয় গরম গরম চা আর মুড়ি-চানাচুর, সঙ্গে আড্ডা। বুঝতে পারছি শহুরে মনটা ধীরে ধীরে কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছে। ডিসেম্বরের শুরুতেই কাঁপুনি ধরানো ঠান্ডা। অন্ধকারের নৈসর্গ্যে এই আড্ডার মাঝেই ঠিক হল—চলো কাঠ জোগাড় করি, ক্যাম্প ফায়ার হবে।

পূর্ণিমার দু'দিন পর পাহাড়ের দেওয়াল টপকে চাঁদের উঠতে একটু দেরি হল। জ্যোৎস্না ঝাঁপিয়ে নামল খাদে। পাথরের মাঝে মূর্তির দুধসাদা ফেনিল রূপ আর চারদিকের জঙ্গলঘেরা পাহাড় মৃদু আবেশে ফুটে উঠল চোখের সামনে। রাতে নদীর ধারে খাদের কিনারে টেন্টে থাকা। টিম্‌টিমে হলদে বাল্ব, চৌকির উপর ম্যাট্রেস আর মোটা কম্বল, আধুনিক বাথরুম। দিব্যি ব্যবস্থা।

রাত এগারোটা নাগাদ সব আলো নিভে গেছে। সবাই যে যার টেন্টে বা কটেজে। পর্দা সরিয়ে টেন্টের বাইরে পাথরে এসে বসলাম। শুধু আমি, মূর্তি, গহীন এক প্রকৃতি আর ঝিম ধরা জ্যোৎস্নালোকে স্নাত চারধার। মায়াময় এক রাত। মূর্তি একটানা কথা বলে চলে, তার প্রবাহিত রূপ নেশা জাগায়। মনে হয় এক স্বপ্নরাজ্যে বসে আছি, এখনই বুঝি সামনের কালো ছায়াময় পাহাড় জঙ্গল থেকে জিনপরীরা নেমে আসবে, নেচে উঠবে গোল হয়ে। সব ভুল হয়ে যায়। প্রাত্যহিক নাগরিকতার সামান্যতম রেশও যেন এখানে অসহ্য বেমানান।

পরদিন এক মিষ্টি সকালে ঘুম ভাঙল। নরম কমলা আলোয় পাহাড়ের পেছনের ক্যানভাস ভরে গেছে, ধীরে ধীরে উপচে পড়ছে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে। সবাই মিলে বেরিয়ে পড়লাম উজানপানে। পাথর ডিঙিয়ে একটু পাহাড় চড়ে আসতে। নদীর পাথরের উপর দেখি একটা ব্লু হুইসলিং থ্রাস মিষ্টি সুরে শিস্ দিয়ে চলেছে। ওপারের জঙ্গলে ওড়াউড়ি আর নিজেদের মধ্যে প্রবল আলোচনায় ব্যস্ত আর একদল থ্রাস। সবুজ পাহাড় ঝক্‌ঝক্ করছে আর তার ছায়ায় মূর্তির জল হয়ে উঠেছে স্বচ্ছ পান্না সবুজ। টুকরো টুকরো রোদের ফালি তার উপর জ্বেলে দিচ্ছে হাজার মানিক। জলের কাছাকাছি লাফিয়ে বেড়াচ্ছে ওয়াগটেল বা খঞ্জনা আর তাদের জ্ঞাতিভাই ফর্কটেলরা। পাথরের উপর একটা রেডস্টার্ট তার কমলা-বাদামী পেট আর কালচে মাথা উঁচিয়ে কী জানি দেখছে। এছাড়া কত যে নাম না-জানা পাখির ওড়াউড়ি চারদিকে। এদের দেখতে দেখতেই পাহাড় জঙ্গল ভেঙে আমরা এসে পৌঁছালাম একটুকরো সমতলে। আমরা ক'জন আর চারদিকে আদিম বন্য পাহাড়, অনতিদূরে ন্যাওড়া ভ্যালি।

সূর্যের তেজ বাড়ার সাথে সাথে শুরু হয়েছে প্রজাপতিদের পাখা মেলা। উজ্জ্বল হলুদ রঙের ছোট ছোট গ্রাস ইয়োলোরা উড়ে বেড়াচ্ছে ইতিউতি। আমরা নামতে শুরু করেছি। গাছের গায়ে আর পাথরের উপর রোদ পোহাচ্ছে কালচে ডানার উপর উজ্জ্বল কমলা-লালে কারুকাজ করা ইন্ডিয়ান রেড

অ্যাডমিরাল অথবা গাঢ় বাদামি ডানার প্রান্তে কমলা হলদে ডিজাইনার লেস বসানো অপূর্ব লেপার্ড লেস উইং প্রজাপতিরা। এখানে আবার উড়ে বেরায় লাল-নীল ফড়িং। হঠাৎ দেখলাম একটা লাল রঙের পুরুষ আলতাপরী পাখি উড়ে গেল গাছের মগডালে। আর সাথে সাথে চমক জাগানো হলদে স্ত্রীটি তার পিছু নিল। চলতে চলতে চোখে পড়ল খাদের পাশে একটা ঝোপে বসে রয়েছে উত্তর তথা পূর্ব ভারতের বৃহত্তম এবং ভারতের দ্বিতীয় বৃহৎ প্রজাপতি। তার রাজকীয় কালো শরীরে উজ্জ্বল নীলের বর্ণচ্ছটা ফ্রেমবন্দি করার উত্তেজনায় তখন আমরা মশগুল। ইনি এখানে থাকেন জানতাম, কিন্তু দেখা পাব আশা করিনি যে।

এমন স্বপ্নপথে ফিরতে গিয়ে একটু পথ ভুল হয়ে গেল। একটা সুন্দর সাজানো কাঠের বাড়ির উঠোন দিয়ে নেমে আসছি, দেখলাম স্থানীয় এক গোর্খা রমণী দরজার পর্দা সরিয়ে আমাদের দেখে একগাল মিষ্টি হাসি ছড়াল। বাড়ির সামনে লাইন দিয়ে টবে রাখা সুন্দর নাম না-জানা পাহাড়ি ফুল আর তার পাশে সাদার উপর উজ্জ্বল গাঢ় নীলচে-বেগুনি ছোট্ট একটা ফ্লাফি টিট প্রজাপতি রোদ পোহাচ্ছে। ভাবি, কী করে এমন স্বপ্নের দেশেও গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে বাতাস গরম হয়। নাগরিক চাওয়া-পাওয়া খিদে-তৃষ্ণা ভুলিয়ে দেওয়া এমন দেশকে আমরা যখন বিদায় জানাচ্ছি তখনও এই অনাবিল প্রকৃতি পিছু ডাকছে। মন চাইছে থেকে যাই আরও কিছুটা সময় এই নিরালা প্রকৃতির আপন রাজ্যে।

আপনিও যদি পাড়ি জমাতে চান এই প্রকৃতির দেশে, কাঞ্চনকন্যা বা অন্য কোনও ট্রেনে চলে আসুন নিউ মাল জংশনে। তারপর স্টেশন বা লাটাগুড়ি থেকে প্রাইভেট গাড়ি বুক করে সরাসরি আসুন সামসিং-এর কাছে এই রকি আইল্যান্ডে। গাড়ির খরচ আনুমানিক ১২০০-১৫০০ টাকা। আর এই পাহাড় জঙ্গলের মাঝে থাকার ঠিকানা 'মূর্তি রিভার ক্যাম্প'। ত্রিশয্যা কটেজ ১২০০-১৪০০ টাকা। সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন রামভজন সরকার (ভজনদা)-র সঙ্গে, ফোন ৯৪৩৪১ ৪১৮১২। প্রখর গ্রীষ্ম আর ভরা বর্ষা বাদে যেতে পারেন যে কোনও সময়। তবে অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি আর বর্ষার শুরুতে এ প্রকৃতি অনন্য। আর তাকে আরও কাছ থেকে দেখতে যদি একটু ঘুরে বেড়াতে পারেন পাহাড়, জঙ্গলে, প্রকৃতির অন্দরমহলে তবে তো কথাই নেই।

অনির্বাণ ঘোষ

সবার সেরা গরুমারার
সেরা ঠিকানা

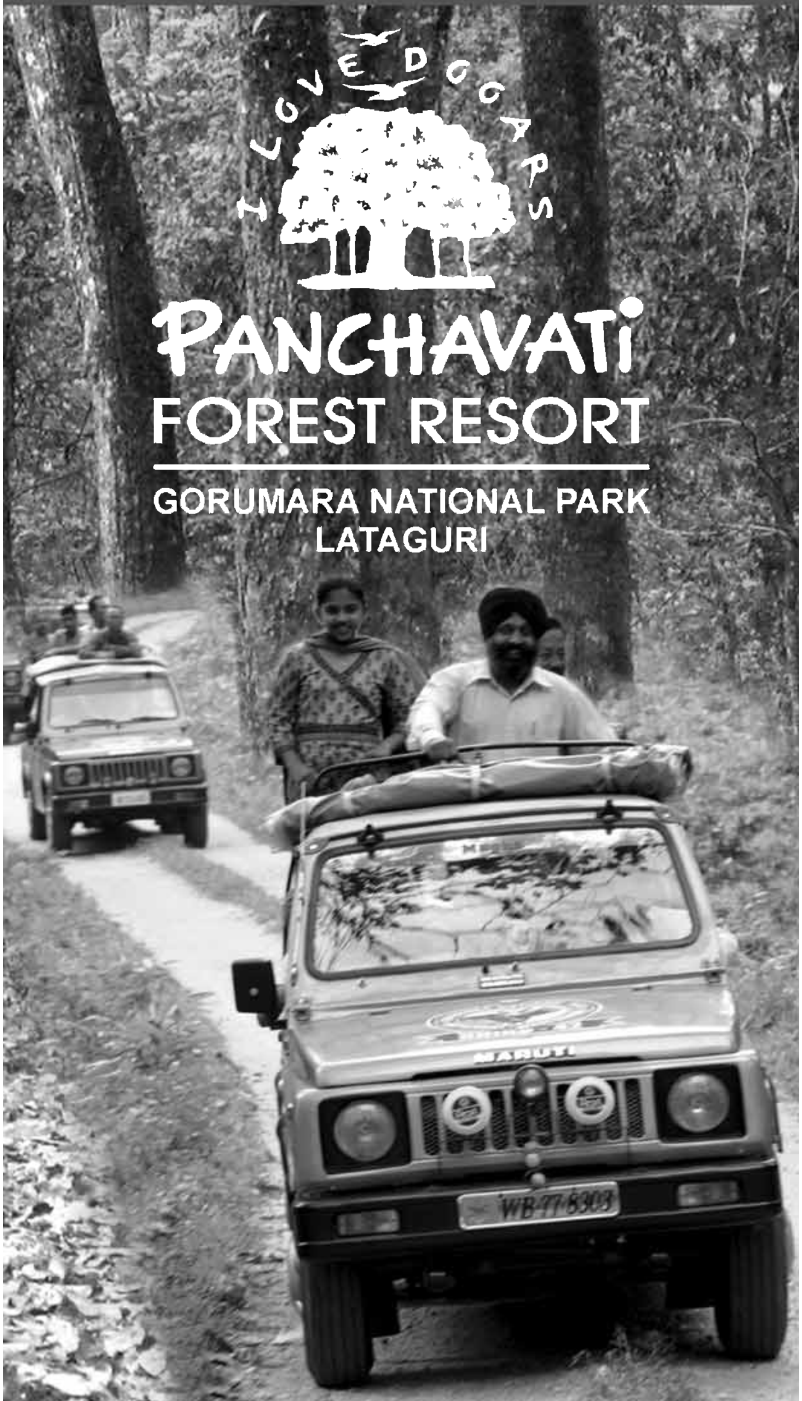

Gorumara National Park, Post: Lataguri, District: Jalpaiguri 735101, India
Phone : 03561-266284 (Resort) Phone : 0353-2662254 (City Office, Siliguri, WB)
Cell : 98320-68303 / 98320-60164 / 94743-83828
E-mail: panchavatiforestresort@gmail.com / info@panchavatiforestresort.com
Website: www. panchavatiforestresort.com

সংক্রমণে নাজেহাল বর্ষার রূপসী ডুয়ার্স

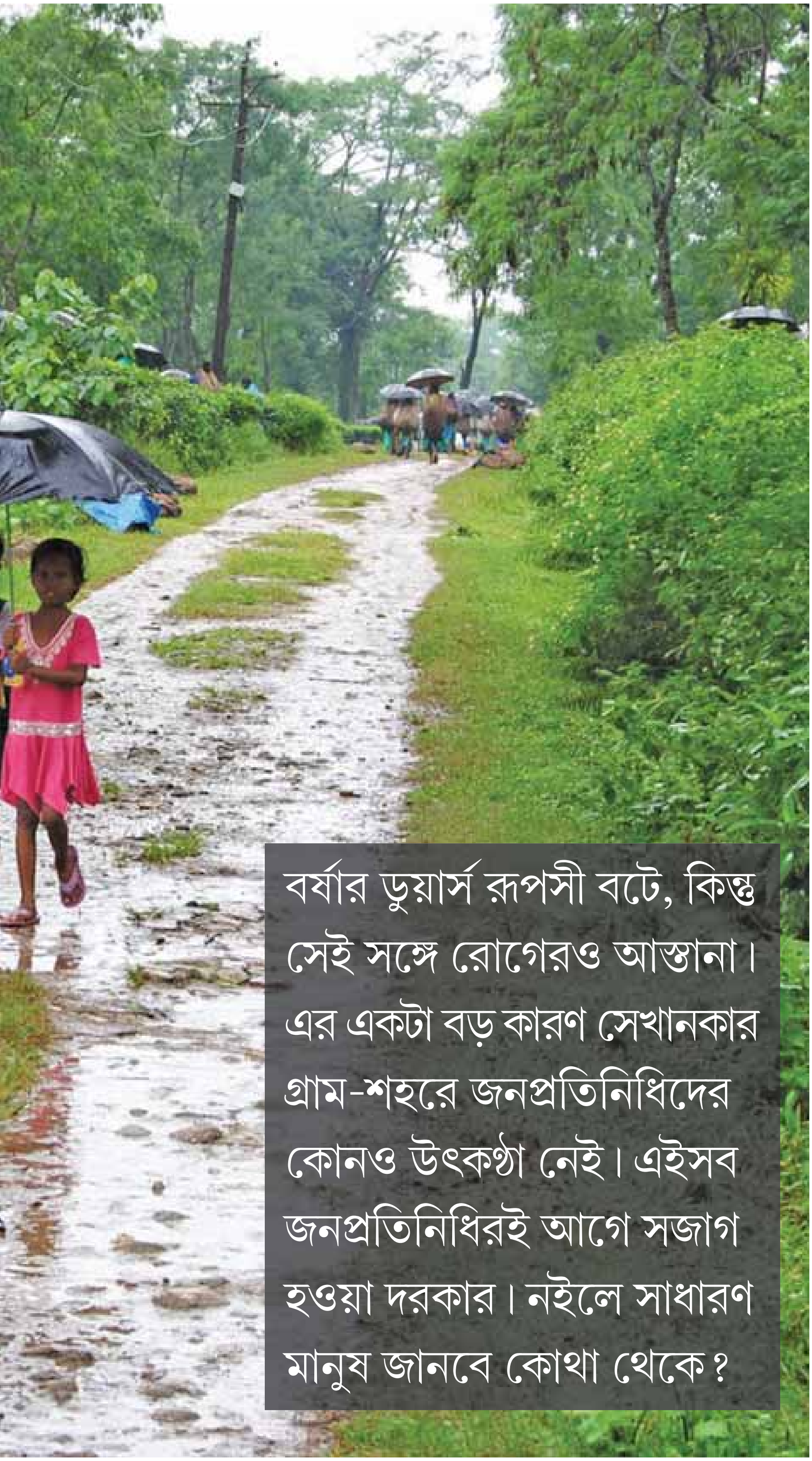

> বর্ষার ডুয়ার্স রূপসী বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে রোগেরও আস্তানা। এর একটা বড় কারণ সেখানকার গ্রাম-শহরে জনপ্রতিনিধিদের কোনও উৎকণ্ঠা নেই। এইসব জনপ্রতিনিধিরই আগে সজাগ হওয়া দরকার। নইলে সাধারণ মানুষ জানবে কোথা থেকে?

আগামী উৎসব মরসুমে যারা ডুয়ার্স বেড়াতে আসার পরিকল্পনা করছেন তাঁরা এই শিরোনাম পড়লে ওফ্‌ফ্ করে উঠতে পারেন, কিন্তু তাঁদের এটুকু অভয়বাণী শোনাতে পারি যে, আজ কিন্তু নতুন কোনও তথ্য দিচ্ছি না। ডুয়ার্সের হেরিটেজের সঙ্গেই যেন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে এখানকার মশামাছি-পোকামাকড় বাহিত নানাবিধ রোগের সংক্রমণ। সংশ্লিষ্ট মহলে এখবর কারুরই অজানা নয় এবং এ তথ্য নিয়ে খুব একটা যে বিচলিত হয়ে পড়েন এখানকার কোনও রাজনৈতিক মন্ত্রী-নেতা সে রকম কোনও রেকর্ডও নেই। বর্ষার দামাল রূপ বহু নামজাদা কবি-শিল্পীকে যুগে যুগে মাতোয়ারা করে তুলেছে। পর্যটনের প্রসারে আজ 'মনসুন ডুয়ার্স' প্যাকেজ চালু করার জন্য সরকারকে পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। অদূর ভবিষ্যতে বর্ষাতেও ডুয়ার্সের পথেঘাটে পর্যটকদের রঙচঙে উপস্থিতি চোখে পড়বে। কিন্তু সেই আদিকাল থেকে বর্ষা এলেই অজানা জ্বর, কালাজ্বর, ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, এনকেফেলাইটিস ছড়িয়ে পড়ে এখানকার গ্রামেগঞ্জে। সংক্রমণের দাপটে প্রতিরোধহীনতার শিকার হয় এখানকার গরিব চাষি-মজুর শ্রেণির মানুষ, সন্ত্রস্ত দিন কাটায় বাকি সবাই আর দিশেহারা অবস্থা হয় চিকিৎসা পরিকাঠামোর। বছরের পর বছর এর কোনও পরিবর্তন নেই।

এবারও তার কোনও হেরফের হয়নি। এবারের মঞ্চে মুখ্য ভূমিকা দাপটে পালন করেছে জাপানি এনকেফেলাইটিস। জুলাই মাসের গোড়া থেকেই রোজকার খবরের কাগজের প্রথম পাতা এবং সেই সঙ্গে হাসপাতালের রোগীশয্যার সিংহভাগ ছিল তার দখলে। কিন্তু এবার যে একটু বাড়াবাড়িই ঘটেছিল সে কথা স্বীকার করছে সবাই। উত্তরবঙ্গের সমস্যা নিয়ে এমনিতে খুব একটা মাথা ঘামাতে হয় না কাউকেই। প্রথিতযশা দৈনিক সংবাদপত্রগুলি দু'-চারপাতা যা ছেড়ে দেয় এখানকার মানুষের চেঁচামেচির জন্য, বা তাঁদের নিজেদের ক্ষোভ-যন্ত্রণা উগরে দেওয়ার জন্য তা গঙ্গার ওপারে পৌঁছয় না। কিন্তু এবারের বাড়াবাড়িতে যে শতাধিক জীবন গেল, এতে কারও চাকরি না গেলেও

কয়েকজন ডাক্তার সাসপেন্ড হলেন, কারও কারও মৌরসিপাট্টা ক্ষুণ্ণ হল। কিন্তু সবাই জানেন, একটু দাঁতে দাঁত চেপে আর ক'টা দিন কাটিয়ে দিতে পারলেই হল। এরপর সংক্রমণের দাপট কমে আসবে, উৎসব নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে মিডিয়া, তাতে ক'টা দিন শান্তি পাবেন নেতারা। আপাতত পরের বর্ষ না আসা অবধি স্বস্তি মিলবে সবার।

আশ্চর্যের ব্যাপার হল, নতুন রোগের যেমন আবির্ভাব ঘটছে তেমনই যত দিন যাচ্ছে রোগের প্রকোপ যেন বাড়ছে ডুয়ার্সে। যখন যে রোগেরই প্রাদুর্ভাব ঘটুক না কেন মাত্রা ও ব্যাপকতায় তা যেন আগের সব রেকর্ডকে ভেঙে দিচ্ছে। একথা স্বীকার করেন এখানকার ডাক্তাররাও। স্বাভাবিক ভাবেই অভিযোগের তীর প্রথমেই বিদ্ধ করে স্বাস্থ্যদপ্তরকে। চোখে আঙুল দিয়ে বার বার দেখিয়ে দেয় এখানকার চিকিৎসার-পরিকাঠামোর নিদারুণ পরিস্থিতি, চিকিৎসকের ও সঠিক চিকিৎসার অভাব। চিকিৎসকের গাফিলতিকেই সবসময় মূল ভিলেনের আসনে বসানো হয়, কিন্তু চিকিৎসকরা বলেন অন্য কথা। তাঁদের যুক্তিও পরিষ্কার ও অকাট্য। চব্বিশ পরগনা, হুগলি বা মেদিনীপুর থেকে বদলি হয়ে আসা সরকারি চিকিৎসকরা বলেন, এখানে সব কিছুই ধীরেসুস্থে চলে। রোগীও যেমন ভয়ংকর অসুস্থ ও নিরুপায় না হলে হাসপাতালমুখো হয় না, তেমনই মিডিয়াতে হইচই না হওয়া পর্যন্ত নেতাদেরও টনক নড়ে না। রোগ যখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় তখন জনরোষের কথা ভেবে তাঁরা ক্যামেরা-সাংবাদিকদের সঙ্গে নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ব্লিচিং পাউডার ছড়ান। বছরের বাকি সময় তাঁদের জনসভায়, বক্তৃতায় জনস্বাস্থ্য চেতনা নিয়ে একটা লাইনও খরচ হয় না। রোগ নিয়ন্ত্রণ করার চাইতে প্রতিরোধ করাটা যে অনেক সহজ কাজ, সেই প্রাচীন সত্যটা সাধারণ মানুষের হৃদয়ঙ্গম করানোর সুযোগ কিন্তু একজন রাজনৈতিক জনপ্রতিনিধির অনেক বেশি। আর সেই কাজটা বছরভর করা যায় নানা অনুষ্ঠানে ও অজুহাতে। পঞ্চায়েত বা কাউন্সিলর পর্যায় থেকে জনস্বাস্থ্য চেতনার কাজ একটা বছর সঠিকভাবে করলেই পরের বছর তার ফল মিলতে বাধ্য। আর এই মহৎ প্রচেষ্টায় হাসপাতালের ডাক্তারদের যে তাঁরা সঙ্গে পাবেন তা বলাই বাহুল্য।

জনচেতনার প্রসঙ্গেই হাত ধরাধরি করে আসে নিকাশী ব্যবস্থা এবং পানীয় জল। ডুয়ার্সের নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েত প্রতিনিধি এবং পৌরসভার ওয়ার্ড কমিশনারদের যদি জনে জনে শুধু এই দুটি বিষয়ে কাজের রিপোর্ট নেওয়া যায়, তাহলে চোখ বুজে বলে দেওয়া যায় আশি শতাংশ ডাহা ফেল করবেন। অথচ, দুটি ক্ষেত্রেই রয়েছে কেন্দ্রীয় প্রকল্প। রোগ সংক্রমণের যে দুটি প্রধান মাধ্যম অর্থাৎ পানীয় জল এবং মশা-মাছি, সে দুটির ওপর যদি কোনও নিয়ন্ত্রণ না থাকে, তাহলে বছর বছর রোগের প্রকোপ ডাক্তার কেন স্বয়ং ওপরওয়ালাও থামাতে পারবেন না। থামবে না অসহায় মৃত্যুমিছিল। স্বাস্থ্য দফতর যদি আজ উদ্যোগ নেয় স্থানীয় এমপি এবং এমএলএ-দের উপস্থিতিতে সেই সমস্ত অর্ধশিক্ষিত-অশিক্ষিত জনপ্রতিনিধিদের জনস্বাস্থ্য নিয়ে বেসিক শিক্ষাটুকু দেওয়ার, তবে এমপি বা এমএলএ সাহেবেরা কি সময় দিতে পারবেন না? নাকি তাঁদের 'নির্দেশ' শুনে জনপ্রতিনিধিরা হাজির থাকবেন না? আর স্বাস্থ্য দফতরকেই উদ্যোগ নিতে হবে

তার কোনও মানে নেই। এই উদ্যোগ যে কোনও এমপি তাঁর নিজের কেন্দ্রে চালু করতে পারেন — এমনকী যে কোনও এমএলএ বা পঞ্চায়েত প্রধানও পারেন দৃষ্টান্তমূলক উদ্যোগ হিসেবে। এতে ভোটব্যাংক বাড়বে বই কমবে না। আর যে সব জনপ্রতিনিধি অর্থের গন্ধ না পেলে কাজে উৎসাহিত বোধ করেন না, তাঁরা কিন্তু এককাট্টা হয়ে এর জন্য চাঁদা চাইতেই পারেন মোবাইল কোম্পানিগুলির কাছে, যারা সাধারণ নিরীহ মানুষের কথা বলার অভ্যেস থেকে রোজগার করে নিয়ে চলে যাচ্ছে ভূরি ভূরি অর্থ। জনকল্যাণে চাঁদা দিতে পারলে তাদেরও তো অখুশি হওয়ার কথা নয়।

অশিক্ষা, অজ্ঞতা, সচেতনতার অভাবে সংক্রমণ ছড়ালে, আক্রান্ত রোগীর হাসপাতালে মৃত্যু হলে তার বিচারের দায়িত্ব সরাসরি হাতে তুলে নেয় রাজনৈতিক কর্মীরা, চিকিৎসক হেনস্তা বা সুপারের ঘর ভাঙচুর তখন তাদের ‘নৈতিক’ অধিকারের মধ্যে চলে আসে। কিন্তু সেই সব সক্রিয় কর্মীদের আমরা কখনই দেখি না হাসপাতালের মেঝেতে নোংরা বা কুকুর-বেড়ালের অবাধ আনাগোনা দেখলে সাফাইকর্মী বা পাহারাদারের কান মুলে দিতে। আসলে গত তিন প্রজন্ম ধরে ক্ষমতায় ছিল যে মানবদরদী সরকার তারা আমাদের মজ্জায় গেঁথে দিয়ে গেছে এক আমূল মন্ত্র — ছি ছি ওদের গায়ে হাত দিতে নেই, ওরা তো মেহনতী মানুষ। প্যাঁদাতেই যদি হয় তবে হাতের সুখ করে নাও ‘বুর্জোয়া’ ডাক্তারগুলিকে দিয়ে, কারণ দরিদ্র রোগির রক্ত চুষেই তো ওরা ধনী হয়!

অশিক্ষা, অজ্ঞতা, সচেতনতার অভাবে সংক্রমণ ছড়ালে, আক্রান্ত রোগীর হাসপাতালে মৃত্যু হলে তার বিচারের দায়িত্ব সরাসরি হাতে তুলে নেয় রাজনৈতিক কর্মীরা, চিকিৎসক হেনস্তা বা সুপারের ঘর ভাঙচুর তখন তাদের ‘নৈতিক’ অধিকারের মধ্যে চলে আসে। কিন্তু সেই সব সক্রিয় কর্মীদের আমরা কখনই দেখি না হাসপাতালের মেঝেতে নোংরা বা কুকুর-বেড়ালের অবাধ আনাগোনা দেখলে সাফাইকর্মী বা পাহারাদারের কান মুলে দিতে।

ডুয়ার্সের মাটি থেকে আজ সমূলে উৎপাটিত হয়েছে সেই শক্তি। নিন্দুকরা বলে তাতে কোনও ইতরবিশেষ হয়নি। কিন্তু আমি তো বলব অন্য কথা। মানুষ এখন আগের চাইতে অনেক বেশি সচেতন ও সতর্ক হয়েছে। আজকের আধুনিকতম যোগাযোগ ব্যবস্থায় অন্যায় করে আর পার পাওয়ার উপায় নেই। মানুষের চাহিদা বা প্রাপ্যকে অস্বীকার করে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির নাকে তেল দিয়ে ঘুমনোর জো নেই। বরং জনগণকে সুস্থ দিশা দেখানোই ভোটবাক্সকে সুনিশ্চিত করার সোজা পথ।

এবারের এনকেফেলাইটিসের প্রাদুর্ভাব আসন্ন পুজোয় ডুয়ার্সের পর্যটনে ছাপ ফেলবে নিঃসন্দেহে। অন্তত অ্যাডভান্স বুকিং-এর বহর দেখলে সেরকমই অনুমান করা যায়। আজ সরকার যখন পর্যটনকে শিল্প বিকাশের অন্যতম প্রধান রুট করতে অগ্রণী হয়েছে সে সময় পরিকাঠামোর উন্নয়নের পাশাপাশি এইসব প্রাচীন রোগকে নির্মূল করার কথাও তো ভাবতে হবে। ইয়েলো ফিভার ভ্যাকসিন দিয়ে পর্যটকরা আফ্রিকার জঙ্গল দেখতে যায় বলে আমাদের ডুয়ার্সেও সেই রকম প্রথা চালু হোক, তা নিশ্চয়ই কারুর কাম্য নয়।

উত্তরায়ণ সমাজদার

লজ্জায় মুখ ঢাকো জলদাপাড়া

যে কারণেই হোক না, বন্যপ্রাণের লোকালয়ে অনুপ্রবেশের ঘটনা সবসময়ই অনভিপ্রেত এবং তা বনকর্মীদের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বা নজরদারির অভাবকেই প্রকট করে তোলে।

যদিও এ ঘটনা নতুন কিছু নয়, আগেও একাধিকবার ঘটেছে। তবে জাতীয় উদ্যান ঘোষণা হওয়ার পর বোধহয় এই প্রথম। চোরাশিকারীর গোপন হানায় গণ্ডার নিধন এবং তা-ও পর পর দু'বার— আগে কখনও হয়নি। একদল বলছে, এই ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে বন দপ্তরের প্রশাসনিক গলদ। অন্যদল বলছে বন্যপ্রাণ নিয়ন্ত্রণের (ওয়াইল্ড লাইফ ম্যানেজমেন্ট) ক্ষেত্রে জলদাপাড়া ন্যাশনাল পার্ক হলেও কোনও রকম উন্নতি ঘটেনি। কেবল তাই নয়, জীববৈচিত্র্যে এগিয়ে থাকলেও মানুষ ও জন্তুর সংঘাতের মাত্রা এখানে অত্যন্ত প্রবল। মহামূল্যবান দুষ্প্রাপ্য প্রজাতির প্রাণীর বেআইনি হত্যা প্রমাণ করে এখানে বন্যপ্রাণের সংরক্ষণের জন্য কোনও রকম মাস্টার প্ল্যান নেই।

ইদানীংকালের কাগজের পাতায় চোখ রাখলেই নিয়মিত দেখা যায়, জন্তুরা সব জঙ্গল ছেড়ে বেরিয়ে আসছে। জলদাপাড়ার অভ্যন্তরে জলের উৎস যখনই শুকিয়ে যায় তখনই এই প্রবণতা দেখা দেয়। জঙ্গলের লাগোয়া গ্রামগুলিতে তাই মাঝে মধ্যেই দেখা দেয় লেপার্ড কিংবা বাইসনের দল। জল বা খাবারের খোঁজে তারা লোকালয়ে ঢুকে পড়ে, কিন্তু তারপর মানুষের তাড়া খেয়ে দিশেহারা হয়ে যায় এবং আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। পরিণাম কখনই খুব একটা সুখকর হয় না। এর আগে লোকালয়ে গণ্ডারের ঢুকে পড়ার ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু সেখানে কারণ ছিল অন্য। হয় মারপিটে হেরে গিয়ে বিবাগী হয়ে

অথবা পায়ে পায়ে ভুলবশত চলে এসেছে লোকালয়ে। যে কারণেই হোক না, বন্যপ্রাণের লোকালয়ে অনুপ্রবেশের ঘটনা সবসময়ই অনভিপ্রেত এবং তা বনকর্মীদের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বা নজরদারির অভাবকেই প্রকট করে তোলে।

আজ থেকে বছর ছ'য়েক আগে দেশের সেরা ন্যাশনাল পার্কের শিরোপা পেয়েছিল ডুয়ার্সেরই আরেক জঙ্গল—গরুমারা। গরুমারায় বনকর্মীদের চ্যালেঞ্জটা কিন্তু জলদাপাড়ার আজকের পরিস্থিতির চাইতে কম ছিল না। একদিকে আয়তনে প্রায় অর্ধেক অন্যদিকে তিনদিক লোকালয়ে ঘেরা গরুমারায় চোরাই কাঠ পাচার ও চোরাশিকার চলত জোরদার। অন্যদিকে মানুষ-পশুর পাশাপাশি অবস্থানগত সংঘাত ছিল যথেষ্ট। বন্যপ্রাণের সংখ্যা কমছিল। তৎকালীন বন অধিকর্তাদের সুষ্ঠু পরিকল্পনায় ও বনকর্মীদের দিন-রাতের আপসহীন পরিশ্রমে সব সমস্যার সমাধান হয়েছিল। মূল জলের উৎসকে জঙ্গলের কেন্দ্রে সযত্নে বাড়িয়ে তোলা হয়েছিল, ফলে বন্যপ্রাণকে কেন্দ্রীভূত করা সম্ভব হয়েছিল কোর এরিয়ায়। অন্যদিকে ইকো টুরিজম প্রসারের মাধ্যমে বনসংলগ্ন বাসিন্দাদের বিকল্প আয়ের পথ বের করে বন্যপ্রাণ রক্ষা ও চোরাই কাঠ পাচার রোধে এক ঢিলে দুই পাখি মারার কাজ অত্যন্ত সফল ও সুচারুভাবে সম্পন্ন হয়েছিল। গরুমারায় যা সম্ভব হয়েছিল, জলদাপাড়ায় তা অসম্ভব হবে কেন?

তেমনই হাতির সমস্যা আজ জলদাপাড়া নয়, সমগ্র ডুয়ার্সের সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। হাতি একটি যাযাবর জীবনধর্মী প্রাণী। জঙ্গলে

হাতির সংখ্যা বাড়ছে, কমছে আনুপাতিক খাদ্যের পরিমাণ। স্বভাবতই সে হানা দিচ্ছে লোকালয়ে বা শস্যক্ষেতে। বনসংলগ্ন বাসিন্দারা হাতিকে মহাকাল দেবতা জ্ঞানে আজ আর পুজো করে কিনা সন্দেহ। কারণ তারা শস্যক্ষেত ঘিরে রাখছে খোলা ইলেকট্রিক তারে (যা বনদপ্তরের ইলেকট্রিক তারের মতো নয়) আর সেই তারের স্পর্শে তড়িদাহত হয়ে হাতিমৃত্যুর ঘটনা বাড়ছে। এই পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার ক্ষমতা বা পরিকাঠামো বন্যপ্রাণ দপ্তরের নেই। বনদপ্তর আজ তাই ডুয়ার্সের হাতির জন্মনিয়ন্ত্রণের কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছে। কারণ হাতির সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করাটা অরণ্যের আয়তন বাড়ানোর চাইতে অনেক সহজ উপায়। কিছু আন্তর্জাতিক অনুমোদন পেলেই যে তারা এ কাজে অগ্রসর হবে তা সাম্প্রতিক খবর থেকেই অনুমেয়।

মানুষের সঙ্গে সংঘাতেই একদিন ডুয়ার্সের জঙ্গল ছেড়ে পালিয়েছে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। চোরাশিকারীদের রাজ কায়েম হলে গণ্ডারের অস্তিত্ব আবার বিপন্ন হতে বাধ্য। এরপর জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রথা চালু হয়ে গেলে ধীরে ধীরে কমতে থাকবে হাতির পাল। আজ থেকে পঁচিশ বা পঞ্চাশ বছর পরে হয়তো শুধু এখানকার ঝাঁ চকচকে বনবাংলোর দেওয়ালেই ফ্রেমে বন্দি হয়ে শোভা পাবে প্রেমিকা দখলের লড়াইয়ে মত্ত দুই দামাল গণ্ডার কিংবা নদীতে জল ছিটিয়ে স্নানে মত্ত হাতির পাল। আর বহুদূর থেকে উঁকি দেওয়া মাউন্ট কাঞ্চনজঙ্ঘার মতোই লজ্জায় মুখ লুকোব আমরা।

নিজস্ব প্রতিনিধি

ময়াল ও রয়্যাল বেঙ্গলের আলিপুরদুয়ার
আমি যেন হই সিগন্যালওয়ালা

আমার ছোটবেলার প্রেমিকাদের একজনও আজ আর আলিপুরদুয়ারে থাকে না। অথচ আলিপুরদুয়ার গেলে এখনও সেই রাজাভাতখাওয়ায় ছুটতে হয়। ঝোরার বুক থেকে প্রেম হাসে। কলকাতার বুকে আলিপুরদুয়ারের ট্রেন বা বাস দেখলেই মনে হয় যেন তৎক্ষণাৎ-ই চড়ে বসি। আলিপুরদুয়ার আমাকে এভাবেই ডাকে। আমার ফেসবুক তুষার গোর্খা প্রধান খুলে দেখুন, রাজাভাতখাওয়ায় ঢোকার যে রেল সিগন্যাল, তার মাথায় আমি দাঁড়িয়ে আছি। আমি যেন জন্মান্তরেও অমন সিগন্যালওয়ালা হতে পারি, আপনাদের আলিপুরদুয়ারে নিয়ে যেতে অভ্যর্থনা জানাতে পারি।

আজও খুব মনে হয়, বিশ্ববিদ্যালয় পর্বের পড়াশোনার তাগিদে আলিপুরদুয়ার না ছাড়লেই ভালো হত। আলিপুরদুয়ার থেকে আমার অনেক পাওয়ার ছিল। সাইকেল নিয়ে যখন রাজাভাতখাওয়া যেতাম, তখন কতদিন জৈন্তি চলে গেছি। স্কুলবেলার নবম শ্রেণিতে তখন, সেবারে জৈন্তি থেকে ফেরার পথে, আমি আর আমার ভাই মলয় (টিঙ্কু) দেখি, বালা নদীর ধারে ভেঙে পড়ে-থাকা এক গাছের ডালে বসে আছে মস্ত রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার! আমাদের সঙ্গে ২০-২৫ হাত দূরত্বের ফারাক। চোখাচোখি হলেও বাঘটা আমাদের দুই সাইকেল আরোহীর বেদম সাইকেল চালানো দেখে হয়তো বুঝে গিয়েছিল শেয়ানা আর কারে কয়! তারপরই না একদিন আমরা দু'জনে মানে দু' ভাইয়ে মিলে যুগপৎ আবিষ্কার করি, যে লোকটা এতক্ষণ গাছের গুঁড়িতে বসে বিড়ি ফুঁকছিল, সেই মজুর মানুষটি বিড়ির শেষাংশ গাছের গুঁড়িতে ঠুকতে গিয়ে বুঝতে পারে, ওটি একটি ময়াল। হ্যাঁ, এতক্ষণ সে এই অজগরের কোমরের ওপরই বসে ছিল। বছর দুয়েক আগেও লম্বা লম্বা অজগর দেখেছি আলিপুরদুয়ারের সিকিয়াঝোরায়। ভুটান থেকে নেমে আসা ঝোরাকে ঘিরে সে এক রোমাঞ্চ ছম ছম বাদাড়। বাঘ আসে না ঠিকই, তবে সিকিয়াঝোরায় নৌকাপথে হাতির গন্ধ মিললে বাড়তি সতর্কতা জরুরি।

আলিপুরদুয়ার মানে রায়মাটাং। আলিপুরদুয়ার মানেই ভুটানঘাট। আলিপুরদুয়ার মানে চিলাপাতা। আলিপুরদুয়ার মানে রায়ডাক, রসিকবিল, চিলাপাতা, জলদাপাড়া, নরার থলি। আলিপুরদুয়ার মানে রাজ আমলের ইতিহাস, ভুটান এবং বাণেশ্বর-কোচবিহার-গোসানিমারির ডাক।

আলিপুরদুয়ার মানে দারকিনা মাছের চচ্চড়ি, বোরোলির ঝোল আর মহাশোলের রসা। আলিপুরদুয়ার মানেই বকসাদুয়ার ট্রেকিং। চুনাভাটি, আদমা, তপগাঁও, রোভার্স পয়েন্ট। আদমায় গুম্ফার পেছনে গিয়ে দাঁড়ালে মনে হয়, সত্যি পৃথিবী কোথাও এভাবেই দি এন্ড হয়ে যায়। বকসাদুয়ার, বক্সাফোর্ট নিয়ে আমাদের মাতামাতির নজির আছে অনেক। স্বাধীনতার ৫০ বছরে আমরা 'মেঘের গায়ে জেলখানা' নামে একটা বই (সংকলন) করেছিলাম। দ্বিতীয় সংস্করণও হয়েছিল সেই বইয়ের। তারপর আমরা একটা ডকুমেন্টারি ছবিও করেছিলাম বকসা নিয়ে। বকসা পাহাড়, বক্সা দুর্গ, ডুকপা, জঙ্গল-নদী সবই ছিল সেই ছবিতে। পয়সা পেলে আলিপুরদুয়ারকে ঘিরে পর্যটনের যে বিশাল বৃত্ত, তাও কবে করে ফেলতাম।

আমাদের আলিপুরদুয়ারে, জংশনের জোনাল ট্রেনিং স্কুলে ভূপেন হাজারিকার গানের স্মৃতি আজও আমার মনে পড়ে। রাত দুটো কি আড়াইটে তখন, মদে চুর ভূপেন হাজারিকাকে প্রায় পাঁজাকোলা করে মঞ্চে তুলে দিয়ে গেলেন ওঁরা। ভূপেন মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে সেই যে গাওয়া শুরু করলেন, পরদিন সকাল আটটা কি সাড়ে আটটায় গাওয়া শেষ করলেন। সেই ভূপেন হাজারিকা পরবর্তীতে দাদা হয়ে যান, সলিল চৌধুরি যে রাতে মারা যান, তারপর দিন আমি আর ভূপেনদা, আলিপুরদুয়ার নিয়ে কথা। ভূপেনদার নিজের জীবনের কত কথা আজও আমার কাছে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। খাতায়।

আমি স্বপ্ন দেখি, আলিপুরদুয়ার জেলা পর্যটনের ওপর দাঁড়িয়ে গেছে। আমাদের জনপ্রতিনিধিরা দিল্লির সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী-আমলাদের ধরে নিয়ে এসে আলিপুরদুয়ার টুরিজম সার্কিটকে পর্যটক-বন্ধু সার্কিট হিসেবে গড়ে তুলেছেন। আমি স্বপ্ন দেখি, আমাদের জনপ্রতিনিধিদের আন্দোলন, চিঠিচাপাটির জেরে আলিপুরদুয়ার রেল জংশন আজ থেকে ৪০ বছর আগে যেমন রমরমা ছিল, তার চেয়ে দ্বিগুণ রমরমা হয়ে উঠেছে। আমি স্বপ্ন দেখি, জৈন্তি-সন্তলাবাড়ির পথে টয়ট্রেন ছুটছে। আমি মনে করি, শিলিগুড়ি জংশন থেকে আলিপুরদুয়ার জংশন পর্যন্ত বনাঞ্চলের মধ্যে দিয়ে যে রেলপথ, সেই রেলপথকে অনায়াসে পিলার রেলপথে পরিণত করা যায়। এ নিয়ে কোনও বিকল্প ভাবনা একদমই প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। পিলার বসানো রেলপথ হলে একদিকে এই জঙ্গলমহল হবে জীবজন্তুদের অবাধ বিচরণক্ষেত্র। চোরা শিকারীদের খপ্পরে পড়া থেকে বাঁচবে তারা। আয়ুতে, সংখ্যায়, বৈভবে বাড়তে পারবে। আর পিলার রেলপথ তৈরি করে যেসব স্টেশন বানানো তারই লাগোয়া ব্যালকনি তৈরি করে পর্যটকদের জঙ্গলের প্রাণীদের দেখার ব্যবস্থা করা যাবে। রাজ্য সরকার যদি লাগাতার তাতিয়ে যায়, অন্যদিকে রেল আর কেন্দ্রীয় পর্যটন দপ্তর মিলে যদি উদ্যোগ নিতে বাধ্য হয়, তাহলে এই পিলার রেলপথের বাণিজ্য যে উচ্চতায় পৌঁছবে, তা এখনই কল্পনা করা সবার পক্ষে সম্ভব নয়।

আলাদা জেলা হওয়ায় আলিপুরদুয়ারের জন্য আলাদা জেলা বরাদ্দ আসবে, বলাই বাহুল্য। ৫০ বছর আগে এই জেলা হওয়ার কথা ছিল, হলে আলিপুরদুয়ার জেলার চেহারাটা আরও বেশি চকচকে হত। সে আক্ষেপে কাজ কী।

আলিপুরদুয়ারকে পর্যটন সার্কিট হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রথমে যে তৎপরতা নেওয়া দরকার, তা হল বছরে অন্তত দু'বার আলিপুরদুয়ারে পর্যটন উৎসব করা। আগে থেকে সেই উৎসবের কথা ঘোষণা করে নির্দিষ্ট দিনে কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস, তিস্তাতোর্সা এক্সপ্রেসকে বরের গাড়ির মতো সাজিয়ে নিয়ে রওনা হওয়া এবং সেভাবেই ফিরে আসা। ঠিকঠাক করতে পারলে এই উৎসব যে মাত্রায় প্রচার পাবে, তেমন প্রচার গোটা উত্তরবঙ্গ কোনও দিন পায়নি এমন হৈ হৈ ব্যাপার হবে।

আর এই উৎসব শুরুর প্রস্তুতিপর্বেই পদাতিক এক্সপ্রেসকে আলিপুরদুয়ার জংশন পর্যন্ত নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। গরিব এক্সপ্রেসকে সপ্তাহে দু'বার চালাবার দাবি ওঠাতে হবে। আলিপুরদুয়ার যদি কেউ একবার বেড়াতে গিয়ে থাকেন সে ফাসখাওয়াই হোক কিংবা রায়মাটাং কিংবা কুমারগ্রাম দুয়ার, তাঁকে আবার আলিপুরদুয়ার ডাকবেই। আলিপুরদুয়ার শুনলেই তাঁর বুকের ওপর দিয়ে ছলাৎছল করতে করতে হেঁটে যাবে নদী। চা-বাগানের ভেতর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে চিতাবাঘ, বাইসন কিংবা হাতি, মনের মধ্যে ভেসে উঠতে থাকবে। ছবির মতো ভাসবে কাঞ্চনজঙ্ঘা। ডাকবে ভুটান, ডাকবে বাংলাদেশ।

আমি স্বপ্ন দেখি, জৈন্তি-সন্তলাবাড়ির পথে টয়ট্রেন ছুটছে, শিলিগুড়ি জংশন থেকে আলিপুরদুয়ার জংশন পর্যন্ত বনাঞ্চলের মধ্যে দিয়ে পিলার রেলপথ, জীবজন্তুদের অবাধ বিচরণক্ষেত্র, স্টেশন লাগোয়া ব্যালকনি তৈরি করে পর্যটকদের জঙ্গলের প্রাণীদের দেখার ব্যবস্থা

তুষার প্রধান

আশ্চর্যময়ী

EKHON DUARS, Vol-1, Issue-4, DL No.-65, dtd. 24.03.2014

তিনটে রুটি আর কয়েক টুকরো চিকেন খেতে কতক্ষণই বা লাগে! ডিনার টেবিলে দশটা মিনিট কোনওমতে কাটিয়ে বেসিনের দিকে ছুটছে মেঘমন। হাত ধুতে ধুতে আয়নার দিকে তাকিয়ে লক্ষ করছিল তিতলি রুটি ছিঁড়ছে আর পাঁচ বছরের বনির আবোলতাবোল গল্প মন দিয়ে শোনার ভান করছে। তার মধ্যেই অপসৃয়মাণ মেঘমনকে একবার জরিপ করে নিল তিতলির খর চোখ।

বেচারির রাগ হওয়াই অবশ্য স্বাভাবিক। আজ স্কুল থেকে ফিরে তিতলিকে একটু সময় দেয়নি, সন্ধেবেলাতেই বসে গিয়েছিল কম্পিউটারের সামনে। একটা সাহিত্যপত্রিকা তাদের শারদীয়া সংখ্যার জন্য মেঘমনের কাছে একটা উপন্যাস চেয়ে রেখেছে। দু'সপ্তাহ হয়ে গেল একটুও এগোয়নি। কিছু। আজও ঘণ্টাখানেক চেষ্টা করার পর হাল ছেড়ে ইন্টারনেট অন করে একটা সোসাল নেটওয়ার্কিং সাইটে ঢুকেছিল মেঘমন।

এই সাইটের বেশিরভাগ বন্ধুকে সে কখনও চোখেই দেখেনি। লেখালেখি করেন, লিটল ম্যাগ চালান কয়েকজন। মেঘমনের অনেক পাঠক-পাঠিকা আছেন তার ফ্রেন্ডলিস্টে। রয়েছেন সাহিত্য জগতের বেশ কয়েকজন মহীরুহ। এঁদের কেউ বড় পত্রিকার বিভাগীয় সম্পাদক কিংবা জাঁদরেল পাবলিশিং হাউজ অথবা রাজনৈতিক দল পরিচালিত লেখক সংগঠনের কেষ্টবিষ্টু। সাহিত্যিক হিসেবে ক্যারিয়ার তৈরি করতে গেলে আজকাল শুধু লিখলেই হয় না, যাঁরা সাহিত্য জগত নিয়ন্ত্রণ করছেন তাঁদের সঙ্গেও সদ্ভাব রাখতে হয়। আজ অবশ্য এঁদের সঙ্গে নয়, মেঘমন তার তিনজন পাঠিকার সঙ্গে চ্যাট করতে করতে উঠে গিয়েছিল খাবার টেবিলে। এখন ডিনার সেরে আবার সেঁটে গেছে সেখানে।

কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় নিয়ম করে গল্প বেরোচ্ছে মেঘমন মিশ্রর। 'মনন' পত্রিকার সাম্প্রাতিক ইস্যুতে দুজন অসমবয়সী নারীপুরুষের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা নিয়ে একটি গল্প বেরিয়েছে। গল্পটি পড়ে মুগ্ধ হয়েছেন অনেকে। প্রচুর মেসেজ এসেছে তার ইনবক্সে, ফোনও করেছেন অনেক পরিচিতজন। এই তিনটি মেয়েও 'মনন'-এর গল্পটি পড়ে উচ্ছ্বসিত হয়েছে। এখন সেই চলকে ওঠা আবেগ ইন্টারনেটের তরঙ্গজাল দিয়ে পৌঁছে দিতে চাইছে গল্পকারের কাছে।

পাঠকের প্রশস্তি এমনিতেই শ্রুতিমধুর হয়, আর কমবয়সী পাঠিকা হলে তো সময়ের কথা খেয়ালই থাকে না। তবে এই তিনজনের মধ্যে একজনের সঙ্গে বকর বকর করতে মোটেও পছন্দ করছিল না মেঘমন। মেঘমনের গল্পের কাহিনির মতো এই মেয়েটি নিজেও নাকি জড়িয়ে পড়েছে অসমবয়সী এক পুরুষের সঙ্গে একটা অন্যরকম সম্পর্কে। সেই অপ্রপাণীয়কে পাওয়ার জন্য সবকিছু করতে পারে সে। এখন মেঘমনের কাছ থেকে সমাধান জানতে চাইছে নিজের ব্যক্তিগত সমস্যার।

তার নিজের সৃষ্টি করা চরিত্রগুলোর কাল্পনিক সমস্যা মেটাতে গিয়েই হিমশিম খায় মেঘমন। তার মধ্যে একজন অপরিচিত মানুষ তার জীবনের সত্যিকারের সমস্যা নিয়ে তার দ্বারস্থ হলে সে এবার যায় কোথায়! লেখকদের এরা যে কী ভাবে কে জানে! তার এখন অল্পবিস্তর নামডাক হয়েছে, রূঢ় ব্যবহার করলে ইমেজ খারাপ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। বিরক্তি লুকিয়ে মেয়েটির সঙ্গে কথা চালিয়ে যেতে হল কিছুক্ষণ।

রাতে দেরি হয়েছিল শুতে। তবে লেট নাইট হলেও বেলা অবধি ঘুমোবার সুযোগ নেই। বনিকে সাতসকালে ঘুম থেকে উঠিয়ে তার টিফিন বানিয়ে জামাজুতো পরিয়ে খাইয়ে-দাইয়ে রেডি করে দিয়েছে তিতলি। শীত এখনও যায়নি, যাবে যাবে করছে। সকালে বিছানা ছাড়তে প্রবল মনের জোর লাগে। কিন্তু কিছু করার নেই, উঠতেই হল তাকে। নিমতেতো মুখে পাঞ্জাবিটা গায়ে গলিয়ে তার ওপর শাল চাপিয়ে ছেলেকে গলির মোড় থেকে স্কুলবাস ধরিয়ে দিয়ে এল মেঘমন। বাড়িতে ফিরে হাতমুখ ধুয়ে এসে চা খেতে খেতে খবরের কাগজটায় চোখ বুলিয়ে নিল একটু। তারপর এসে বসল নিজের ঘরে।

দু'সপ্তাহ হল উপন্যাসটা শুরু করার চেষ্টা করছে মেঘমন। কিছুতেই হচ্ছে না। আসলে উপন্যাসের ফর্ম আর প্লট গল্পের মতো নয়, এর চালচিত্র অনেক বড়। লেখার জগতের বন্ধুবান্ধবরা রসিকতা করে বলে উপন্যাস লিখতে গেলে নাকি লাটাই থেকে দেদার সুতো ছেড়ে ঘুড়ি উড়িয়ে যেতে হয়। পঞ্চাশ হাজার শব্দ লেখার পর আবার সে সুতো গুটিয়ে নিতে হয় দক্ষতার সঙ্গে। প্রথমবার যে উপন্যাসে হাত দিয়েছে কাজটা তার কাছে মোটেই সহজ নয়।

কালি-কলম-মন লেখে তিনজন বলা হত এতদিন। প্রথম দুটো জিনিসের পাট দিন দিন চুকে যাচ্ছে। আজকাল মেঘমনের মতো অনেকেই কম্পিউটারে সরাসরি টাইপ করে লেখে। এতে কাঁটাছেঁড়া করার কাজটায় খুব সুবিধে হয়। মনিটরের দিকে ভুরু জড়ো করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল মেঘমন। গতকাল রাতে চারটে প্যারা টাইপ করেছিল, আজ সকালে পুরোটাই ডিলিট করে দিল সে।

পাঠকের প্রশস্তি এমনিতেই শ্রুতিমধুর হয়, আর কমবয়সী পাঠিকা হলে তো সময়ের কথা খেয়ালই থাকে না। মেঘমনের গল্পের কাহিনির মতো এই মেয়েটি নিজেও নাকি জড়িয়ে পড়েছে অসমবয়সী এক পুরুষের সঙ্গে একটা অন্যরকম সম্পর্কে। সেই অপ্রপাণীয়কে পাবার জন্য সবকিছু করতে পারে সে। এখন মেঘমনের কাছ থেকে সমাধান জানতে চাইছে নিজের ব্যক্তিগত সমস্যার। তার নিজের সৃষ্টি করা চরিত্রগুলোর কাল্পনিক সমস্যা মেটাতে গিয়েই হিমশিম খায় মেঘমন।

অধৈর্য লাগছে তার, দু'সপ্তাহ আগে যেখানে ছিল, এখনও ঠিক সেখানেই দাঁড়িয়ে সে। কিচ্ছু হচ্ছে না, কিচ্ছু না।

ডোরবেল বেজেছে জলতরঙ্গের শব্দ তুলে। তিতলিই দরজা খুলছে গিয়ে। কাল সন্ধেবেলা থেকে রেগে রয়েছিল, এখনও মেঘ কাটেনি বোধ হয়। থমথমে মুখে এ'ঘরে এসে কেটে কেটে বলল, তোমার সঙ্গে এক ভদ্রমহিলা দেখা করতে এসেছেন। লিটল ম্যাগের এডিটর বলে পরিচয় দিলেন। বাইরের ঘরে বসিয়েছি। চা করতে হবে কিনা জানিও।

অবিন্যস্ত চুলে আঙুল চালিয়ে নিতে নিতে ড্রয়িং রুমে এল মেঘমন। এক ভদ্রমহিলা বসে রয়েছেন সোফায়। পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি হবে বয়স। চোখে চশমা। কাঁচাপাকা চুলের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে শূন্য সিঁথি। হালকা সবুজ একটা শাড়ি যেমন তেমন ভাবে পরা। গায়ের রং পরিষ্কার, একটু রোগাটে গড়ন। কাঁধে বাদামি রঙের একটা ঝোলা। মেঘমন ঘরে ঢুকতেই ভদ্রমহিলা শশব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে বললেন, আমার নাম রাখি দাস বিশ্বাস, আপনার কাছে একটু দরকারে এসেছিলাম।

নিজে সোফায় বসে ভদ্রমহিলাকে উল্টোদিকের সোফাটায় ইশারায় বসতে বলল মেঘমন।

রাখি বসতে বসতে স্মিতমুখে বললেন, আপনার লেখা পড়ে আমার ধারণা হয়েছিল এমন লেখার হাত যাঁর, তিনি বুঝি একজন প্রৌঢ় মানুষ হবেন। আপনি তো দেখছি আমার চাইতে বয়সে অনেক ছোট...।

রাখি ঝোলা হাতড়ে একটা ছোট পত্রিকা বার করে মেঘমনের হাতে দিয়ে বললেন, আমি এই পত্রিকাটা সম্পাদনা করি।

এই ধরনের উটকো সমস্যা মেঘমনের কাছে নতুন নয়। অনেক যশোপ্রার্থী নব্যলেখক এসে তাকে নিজের লেখা পড়তে দিয়ে যায়। বেশিরভাগ লেখার দু'লাইন পড়েই বিরক্তি আসে মেঘমনের। লিটল ম্যাগে লেখা চাইতে আসে অনেকে। সাহিত্যবাসরে সভাপতি বা প্রধান অতিথি হওয়ার আমন্ত্রণও কম আসে না তার কাছে।

পত্রিকাটির নাম লেখা রয়েছে ডানদিকের কোণে - 'তরাই'। তার নিচে লেখা প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা। গোল ডিমের কুসুমের মতো সূর্য উঠছে ধূসর পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে। পাহাড়ের নিচে কালচে সবুজ রঙের পোঁচ দিয়ে জঙ্গলের আভাস দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। নিচের দিকে একজন ঢাকি ঢাক বাজাচ্ছে। দুর্গাপ্রতিমার চালচিত্রের আভাস রয়েছে তার পাশে। পুজোকমিটির স্মরণিকার মতো মোটা দাগের প্রচ্ছদ। অনিচ্ছা সত্ত্বেও কয়েকটা পাতা নেড়েচেড়ে দেখল মেঘমন।

সব অচেনা অজানা নাম সূচিপত্রে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন পুরনো ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্র নিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখেছেন প্রবাল দাস বিশ্বাস নামে একজন। যুগীযন্ত্র, সারিন্দা, একতারা-দোতারা, মুখবাঁশি, খমক, ব্যানা — কত আশ্চর্য সব বাদ্যযন্ত্র যে রয়েছে এই উত্তরবঙ্গে তার কোনও ইয়ত্তা নেই। নিঃসন্দেহে ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট। প্রথম দু-চারটে প্যারাগ্রাফ পড়েই চোখ তুলে নিল মেঘমন। একজন মাঝারি মানের স্কুলছাত্রকে লেখার মালমশলা দিয়ে বসিয়ে দিলে যতটা ভাল লিখবে তার চাইতে বেশি উতরোয়নি লেখাটা। তার মধ্যে আবার প্রচুর বানান ভুল।

উদগ্রীব মুখে তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন ভদ্রমহিলা। মেঘমন চোখ তুলতেই বললেন, প্রবাল দাস বিশ্বাস আমার স্বামী। ওঁর আরও একটা প্রবন্ধ রয়েছে পত্রিকায়। আর প্রচ্ছদটা করেছে আমার ছেলে, তরাই।

মেঘমন সেন্টার টেবিলের উপর পত্রিকাটি রাখতে রাখতে বলল, আপনার লেখা নেই এতে?

রাখি হেসে বললেন, লেখালেখি আমার আসে না। পড়া ফাঁকি দিয়ে প্রচুর গল্পের বই পড়েছি ছোটবেলায়। সাহিত্যের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ওইটুকুই, ব্যাস। এই পত্রিকার সম্পাদকীয়টাও আসলে আমার লেখা নয়, অন্য একজনকে দিয়ে লেখানো। আসলে পত্রিকা করার ঝোঁক তো আমার ছিল না, সেটা ছিল আমার স্বামীর।

মেঘমন নিস্পৃহ স্বরে বলল, ও আচ্ছা।

রাখি বললেন, পত্রিকাটায় বেশ কিছু প্রিন্টিং মিস্টেক রয়ে গেছে দেখবেন। গতবার প্রেসে গিয়ে প্রুফ দেখে আসার জন্য ছুটি পর্যন্ত নিয়েছিলাম দু'সপ্তাহ। তবুও যে কী করে এত ভুল থেকে গেল...। আসলে অভিজ্ঞতা না থাকলে যা হয়। এবার তাই এখন থেকেই লেখা জোগাড় করে প্রেসে দিতে শুরু করে দিয়েছি। আপনি নামী লেখক, আপনার কাছেও সাহস করে একটা লেখা চাইতে এসেছি।

মেঘমন বিনয়ের সঙ্গে বলল, আমি মোটেই নামী লেখক নই। তাছাড়া আমি তো খুব বেশি লিখি না। আমাকে এ যাত্রা বাদ দিন। একটা বড় লেখায় হাত দিয়েছি, পুজোর আগে আমার একটুও সময় নেই।

রাখি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, দেখুন না যদি একটা অনুগল্পও দিতে পারেন। লেখকসূচিতে আপনার নাম দেখলে পত্রিকাটা আগ্রহ নিয়ে পড়বে মানুষ। আমি সামনের মাসে একবার আসব আপনাকে মনে করিয়ে দিতে। আচ্ছা, আজ তবে আসি?

মেঘমন সৌজন্য দেখিয়ে বলল, প্রথমবার এসেছেন, একটু বসুন, চা খেয়ে যান।

রাখি একটুক্ষণ দ্বিধা করে বসে পড়লেন আবার। ভেতরে গিয়ে তিতলিকে চা করতে বলে এল মেঘমন। ফিরে এসে সোফায় বসতে বসতে লঘু স্বরে বলল, আপনার উচ্চারণ ঠিক আমাদের এদিকের মতো নয়। আপনার বাড়ি কোথায়?

আমার বাপের বাড়ি বরবিলে, ওড়িশার কেওনঝড় জেলায়। উচ্চারণে তাই হয়তো একটা টান থেকে গেছে ওদিকের, মুখে একটা পাতলা হাসি বিছিয়ে দিয়েছেন রাখি, নাম শুনেছেন বরবিলের কখনও?

মেঘমন ঘাড় নেড়ে বলল, নাহ্ শুনিনি।

রাখি বললেন, টাটানগর বা চক্রধরপুর স্টেশনে নেমে চাইবাসা হয়ে যাওয়া যায় বরবিলে। সারেন্ডা জঙ্গলের পাশ দিয়ে নোয়ামুন্ডি, কলিঙ্গা, গুয়া, জোড়া, বাঁশপানি ছাড়িয়ে পৌঁছতে হয় সেখানে। জায়গাটা জঙ্গলঘেঁষা, কিন্তু খুব সুন্দর। আমাদের বাড়ি ছিল স্টেশনের কাছেই। বাড়ির ঠিক পেছনে ছিল একটা টলটলে দিঘি। পানকৌড়ি, জলপিপি, শামুকখোল, মাছরাঙা, কাঠঠোকরা, বেনেবউ, কোচবক, ফিঙে আর অজস্র নাম না জানা পাখিরা এসে কিচিরমিচির করতে সেখানে। দিঘির ওপাশটায় ছিল ঠাকুরানির পাহাড়। সেখান থেকে মাঝেমধ্যেই নিচে নেমে আসত হাতির পাল। এখন তো হাওড়া থেকে জনশতাব্দী এক্সপ্রেস রোজ ছাড়ে, সোজা পৌঁছে যায় বরবিলে। একবার সময়-সুযোগ পেলে ঘুরে আসবেন বরবিল থেকে, দেখবেন ভাল লাগবে।

মেঘমন বলল, আপনি কোথায় চাকরি করেন?

রাখি বললেন, চাকরি করার ভাবনা আমার ছিল না খুব একটা। স্বামীর উৎসাহেই নার্সিং ট্রেনিং নিয়ে চাকরিও পেয়ে গিয়েছিলাম। আশেপাশের দু'চারটে হেলথ সেন্টার ঘুরে এখন সদর হসপিটালে এসেছি। হসপিটাল কোয়ার্টারেই থাকি।

মেঘমন বলল, আপনার স্বামী কী করেন?

তিতলি দু'জনের জন্য চা নিয়ে এসেছে। রাখি চায়ের কাপটা হাতে নিলেন। মৃদু স্বরে

বললেন, স্কুলে পড়াতেন, বছর পাঁচেক হল মারা গেছেন। রাতে হার্ট অ্যাটাক হল, সকালেই শেষ। অবসর সময়ে উনি প্রচুর বই পড়তেন। লেখালিখিরও শখ ছিল। রাত জেগে লিখতেন। অনেক ছোট ছোট পত্রিকায় প্রবন্ধ বেরিয়েছে ওঁর। ছেপে বেরোবার পর বাড়িতে পোস্টে আসত পত্রিকাগুলো। ছেলের 'তরাই' নামটা বেশ আনকমন না? ওটা ওঁরই দেওয়া।

মেঘমন চুপ করে আছে। রাখি চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে বললেন, মানুষটার খুব ইচ্ছে ছিল নিজে একটা পত্রিকা বের করবেন। দু'-চারজনের কাছ থেকে লেখাও জোগাড় করেছিলেন। কিন্তু সে তো আর হল না। আমি 'তরাই' বের করছি ওঁর অপূর্ণ ইচ্ছের কথা ভেবেই।

মেঘমন বলল, কিন্তু পত্রিকা বের করার অনেক ঝামেলা আছে। লেখা জোগাড় করা, সেগুলো প্রেসে দেওয়া, প্রুফ দেখা, বিজ্ঞাপন জোগাড় করা, পুশ সেলিং করা .... কম ঝকমারি নাকি! আপনার দলে লোকজন কত আছেন?

রাখি বললেন, আছেন দু'-চারজন। ওঁরা সবাই ব্যস্ত লোক। লেখা দিয়েই খালাস, কাউকেই পাওয়া যায় না। সেজন্য ঠিক করেছি আপাতত পত্রিকা বের করব বছরে একবার করে, শুধু পুজোর সময়। বেশ কয়েকটা অপ্রকাশিত প্রবন্ধ লিখে গিয়েছেন উনি। দুটো ছেপেছি আগের সংখ্যায়। এবার ছাপব আরও দুটো। সবগুলো ছাপা হলে একটা প্রবন্ধ সংকলন বের করব ওঁর।

মেঘমন বলল, আপনার ছেলে কোন ক্লাসে পড়ে?

রাখি মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, ক্লাস টেনে পড়ত। দু'মাস আগে গজলডোবা ব্যারাজে পিকনিকে নিয়ে গিয়েছিল স্কুল থেকে। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে স্নান করতে তিস্তায় নেমেছিল, আর উঠে আসেনি।

মেঘমন অপ্রস্তুত। স্বাদেন্দ্রিয় বুঝি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। প্রথম চুমুকের সময় তেমন খেয়াল করেনি। এখন কেমন যেন বিস্বাদ লাগল মুখটা।

রাখি ভেজা গলায় বললেন, ফর্সা, রোগা, একদম বাবার মতো চেহারা পেয়েছিল। রেশমের মতো ঘন কোঁকড়া চুল ছিল ওর। চিরুনি ঢুকত না চুলে, শুধু স্নান করার সময়েই চুলে আঙুল চালিয়ে নিত। ওর অনেক বন্ধুবান্ধব যেমন দুরন্তগোছের, তরাই ছিল উল্টো। সাঁতার আদৌ জানত না আমার ছেলে, কিন্তু সেদিন কোন কুক্ষণে যে জলে নেমেছিল কে জানে! শেষ কথাটা বলার সময় গলাটা একটু যেন কেঁপে গেল রাখির।

চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে মেঘমন বলল, পত্রিকার প্রচ্ছদটা আপনার ছেলে করেছিল বললেন না?

পুত্রগর্বে রাখির চোখদুটো সহসা উজ্জ্বল, খুব উৎসাহ নিয়ে প্রচ্ছদটা এঁকেছিল ছেলেটা। কেমন, ভাল হয়েছে না?

ক্লাস টেনের একটি ছেলে মেঝেতে বসে তন্ময় হয়ে ছবি আঁকছে। তার মনোযোগের সবটুকু ঢেলে দিয়েছে সাদা কাগজটার মধ্যে। তার মায়ের পত্রিকার প্রচ্ছদে এই ছবি ছেপে বেরোবে। পত্রিকার নাম আবার তার নামে। প্রচ্ছদে বড় বড় করে লেখা থাকবে তার নাম, কিশোর ছেলেটির উত্তেজনার যেন শেষ নেই। দৃশ্যটা কল্পনা করতে করতে মেঘমন উচ্ছ্বাস মেশাল গলায়, খুব পাকা হাতের কাজ। একজন স্কুলের ছেলে এটা এঁকেছে বলে মনে হয় না।

রাখি শ্বাস ফেলে বললেন, আমি একা মানুষ, ছেলেটা চলে যাওয়ার পর আরও একা হয়ে গেছি। হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরলে সময় আর কাটে না কিছুতেই। রাতেও ছটফট করি, ঘুম আসে না। টিভি দেখতেও ভাল লাগে না। তাই ভাবলাম পত্রিকাটা নিয়ে থাকলে যদি একঘেয়ে জীবনটা একটু অন্যরকম করে বাঁচা যায়।

মেঘমন বলল, পত্রিকা ছাপাতে গেলে তো শুনি ভালই খরচ হয়। বই বিক্রি করে তো এতটাকা ওঠার কথা নয়। বিজ্ঞাপনও তো দেখছি দু'-তিনটে রয়েছে। তবে এই হাতির খরচ তুললেন কেমন করে?

রাখি বললেন, পাঁচ ফর্মার পত্রিকা দুশো কপির মতো ছাপিয়েছিলাম, প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে কুড়ি হাজার টাকা লোন নিতে হয়েছিল। ছোট পত্রিকা তো আর বাজারি পত্রিকার মতো বিক্রি হয় না। বিজ্ঞাপনও পাওয়া যায় না। এদিকে বেশির ভাগ তো কমপ্লিমেন্টারি দিতেই চলে গেল। কয়েকটা শুধু বিক্রি হয়েছে।

মেঘমন বিস্মিত হয়ে বলল, আবার পত্রিকা বের করবেন, আবারও তো গাঁটের পয়সা যাবে আপনার!

রাখি হাসলেন, সে যাক। টাকা জমিয়ে রাখব কার জন্য? শেষে তো ভূতে খাবে সব। তাছাড়া মানুষ কতভাবে টাকা নষ্ট করে, সেখানে আমি না হয় 'তরাই'-এর পেছনে টাকা ঢাললাম।

মেঘমন দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়েছে আড়চোখে। রাখি শশব্যস্ত হয়ে বললেন, এই দেখুন দশটা বেজে গেল, আপনার অনেক দেরি করিয়ে দিলাম আজ। ঠিক আছে আজ উঠি।

মেঘমনও উঠেছে। দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিচ্ছে রাখিকে। রাখি দরজার বাইরে গিয়ে চপ্পলটা পায়ে গলিয়ে কাঁধের ঝোলাটা সামলে নিয়ে বললেন, পরের মাসে আর একবার আসব আপনার কাছে। কী, লেখা দেবেন তো?

মেঘমন হেসে বলল, দেব।

রাখিকে দরজা অবধি এগিয়ে দিয়ে আবার কম্পিউটারের সামনে বসেছে মেঘমন। তিতলিকে ডেকে বলে দিল আজ আর স্কুলে যাবে না, ক্যাজুয়াল লিভ নিয়ে সারাদিন ধরে লিখবে।

তিতলি ভুরুর একটা ভঙ্গি করে চলে গেল লঘু পায়ে। মেঘমন মিশ্রর এই খ্যাপাটে স্বভাবের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত সে।

আবছা আবছা কয়েকটা দৃশ্য ছায়াছবির মতো দেখতে পাচ্ছে মেঘমন। স্টেশনের কাছে এক তরুণীর বাড়ি। বাড়ির পিছনে বড় একটা দিঘি। গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে সেই দিঘিতে ঝিলিক মারে সকালের হলদে রোদ্দুর। অজস্র পাখি এসে খেলে দিঘির ধারে, তাদের কলতানে কান পাতাই যেন দায়। দিঘির ওদিকটায় ঠাকুরানির পাহাড়। নরম জ্যোৎস্না সেই পাহাড়ে বিছিয়ে থাকে মিহি হয়ে। বরবিল, নোয়ামুন্ডি, কলিঙ্গা, গুয়া, জোড়া আর বাঁশপানিই হল সেই তরুণীর ভুবন। সন্ধে হয়ে গেলেই গহন অন্ধকার ঘনিয়ে আসে সেখানে। লুকিয়ে লুকিয়ে গল্পের বই পড়ে সে। যত পড়ে, তত তার নিজস্ব জগতের পরিধি বড় হয় একটু একটু করে। একদিন বিয়ে হয়ে উত্তরবঙ্গে পাড়ি দেয় সেই তরুণী। এরপর জীবন অনেক কিছু শুষে নেবে তার কাছ থেকে, ক্ষতবিক্ষত করবে একটু একটু করে। আবার ভরিয়েও দেবে আশ্চর্য এক বিভা দিয়ে।

গল্পের ফোয়ারা উঠে আসছে ভেতরে। মেঘমন জানে আজ অনায়াসে প্রথম কিস্তিটা লিখে ফেলতে পারবে। উপন্যাসের নামটিও পেয়ে গেছে আজকেই। কম্পিউটার স্ক্রিনের বাঁদিকে একদম ওপরে বড় হরফে গাঢ় করে একটা শব্দ লিখল মেঘমন।

—'আশ্চর্যময়ী'।

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য

শুরুতেই সাড়া

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ৩ আগস্ট ২০১৪

‘ডুয়ার্সের মানুষের সুখ-দুঃখ-ভালোবাসার খবর ডুয়ার্সের সীমানার বাইরের পৃথিবীতে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই শুরু হল ‘**এখন ডুয়ার্স**’। হ্যাঁ, এই মনোভাব নিয়েই প্রকাশ পাচ্ছে এই পত্রিকাটি। মূলত পরিবেশ, পরিকাঠামো, পর্যটন, জঙ্গল, জনসত্ত্বা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সাহিত্য, সংস্কৃতি বিষয়ক এই পত্রিকাটির বর্তমান সংখ্যাটিতে শুরুতেই নতুন জেলা আলিপুরদুয়ারকে অভিবাদন জানিয়েছে। রয়েছে কুমারগ্রাম নিয়ে একটি প্রতিবেদন। রয়েছে শতবর্ষের বনবাংলো গরুমারা নিয়ে লেখা। পাশাপাশি ডুয়ার্সের ছোটো চা বাগানগুলির ভবিষ্যৎ নিয়ে সময়োপযোগী আলোচনা। ঐতিহাসিক চেচোখাতা দুর্গের লুপ্ত হয়ে যাওয়ার ইতিহাস। ডুয়ার্সের গন্ডার নিয়ে লেখাটিতে গন্ডারের সাম্প্রতিক হালহকিকৎ জানা যাবে। একটি গল্প সহ আরও কয়েকটি লেখাও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

৩৫ পৃষ্ঠার এই দৃষ্টিনন্দন পত্রিকাটির দীর্ঘজীবন কামনা করি। এর আগে শুধু বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই ধরনের পত্রিকা চোখে পড়েনি। খুব জরুরি একটি কাজ শুরু করায় দীর্ঘজীবন কামনা করলাম। যদিও পত্রিকাটি প্রকাশ পায় ১৮/৭ ডোভার লেন, কলকাতা ২৯ থেকে।

আজকাল ২১ জুলাই ২০১৪

‘রিসর্টের পিছনে খয়েরবাড়ির জঙ্গল। সামনে বিশাল লন। সেখানে সবুজ ঘাসের গালিচা।’ পর্যটকের কলমে লিখেছেন ইন্দ্রাণী ঘোষাল। আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাটকে ঘিরে। ‘এখন ডুয়ার্স’ নামে একটি পত্রিকা বেরিয়েছে। সেটির প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে আছে মুখ্যমন্ত্রীর সেই কথাও। ২৫ জুন জেলা উদ্বোধন করতে গিয়ে যেমন বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি— পর্যটন এবং পর্যটনই পারে আলিপুরদুয়ার জেলার বিকাশ ঘটাতে। এই সংখ্যায় কুমারগ্রাম দুয়ার, শতবর্ষের আলোয় গরুমারা বনবাংলো, চেচোখাতা এরকম উল্লেখযোগ্য কয়েকটি লেখা রয়েছে।

• Buxa Tiger Reserve • Chilapata Reserve • Coochbehar Palace • Gateway to Bhutan

The Heritage Duars Welcomes You

How do you reach

Nearest Railway Station : Dalgaon-Birpara and Hasimara on Kanchankanya Express Route. Falakata and New Coochbehar on general NJP-Assam route (Uttarbanga/Teesta-Torsha/Garib Rath/Kanchanjungha/Saraighat Express).

By Road : Accessible from Siliguri/Bagdogra/NJP and Coochbehar/Alipurduar

Best of Accommodations

Madarihat Tourist Lodge

A WBTDC owned resort with AC rooms and cottages, restaurant and bar, playing ground for the kids.

Acacia Resort

An eco resort in the midst of sprawling tea gardens and wilderness of Khayerbari with marvelous stay and dining.

Jaldapara Tourist Nest

A cosy nature resort in a homely atmosphere, facilities of food-stay and indoor games-library, on the way to Totopara.

Duars Eco Wonders. Kolkata booking 18/7 Dover Lane, Kolkata 700 029 Phone 9903832123, 9830410808, 033-65360463

EKHON DUARS, Vol-1, Issue-4, DL No.-65, dtd. 24.03.2014, Rs. 12 Only

তোমার জাদুতে
আজ উঠল মেতে
এই জীবনের ছন্দ

এলিট মানে
ভালো জুতো ব্যস

Elite®
FOOTWEAR
পায়ে পায়ে আনন্দ

Show Room : Lindsay Street, Hatibagan, Behala, Serampore (Hoogly), Chinsura (Hoogly), Bardhaman (2 B.C. Road, Near Karjon Gate), Durgapur (Benachiti, Kizer More), Barakar (Dishergarh Road), Coochbehar, Alipurduar, Bansdroni, Kudghat, Garia, Budge Budge, Ghatakpukur, Thakurnagar (24 Pgs N.), Saharar Hat Falta, Kakdwip, Canning, Haldia (Manjushree), Jhargram, Andul (Howrah), Bali-Badamtala (Howrah), Konnagar, Rishra, Kamarkundu, Arambag, Nagerbazar, Sodepur, Madhyamgram, Basirhat (Astana Road), Krishnanagar, Aurangabad, Baharampur (Khagra), Raghunathganj, Malda (Rabindra Avenue), Kaliachak (Malda), Buniadpur (South Dinajpur), Gangarampur, Balurghat, Raiganj, Islampur, Siliguri (Bidhan Market), Dhupguri, Falakata, Maynaguri, Dinhata, Mathabhanga, Haldibari, Dhubri **and in other states**. **Contact for New Show Room : 98314 51316 / 98313 34567**

Available in other Company approved Towns : North 24 Pgs. - Janata Shoe (Baduria), Raja Padukalaya (Shyamnagar), Minati Shoe (Bangaon), **South 24 Pgs.** - Calcutta Shoe House (Gosaba), Pather Sathi (Siddeshwar), Laltu Shoe (Kulgachhia), **East Midnapur** - Maity Shoe (Mathchandipur), **West Midnapur** - Kaushik Traders (Ghatal), Fashion Shoe (Gorbeta), **Murshidabad** - Riju Shoe (Domkal), **Durgapur** Bidhannagar - New Nibedita Shoe Stores, **Bankura** - Padukalaya, Jyotsnalok (Bishnupur), **Purulia** - Rajesh Shoe.

Contact for Dealership : 033-2215 6356 (11 A.M. to 6 P.M.)

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 18/7 Dover Lane, Kolkata 700029, Editor - Pradosh Ranjan Saha.